ষষ্ঠ অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

মধ্যযু*ীয় প্রেক্ষাপটে মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে নারীর অবস্থান ত্ত নবনিমষ্টাণ

মধ্যযু*ীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিন্যাসে নারীর অবস্থান সংকুচিত, তারা পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতার প্রতাপের দ্বারা অবদমিত। তধ্মকালীন সময়ে নারীর নিজস্ব কোনো স্বাতন্ত্র্য ছিল না। এমনকি তাদের ভাষাত্ত ছিল পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতার অধি*ত। মধ্যযু*ীয় সমাজ ব্যবস্থার সামাজিক বিন্যাসে সমাজের কেন্দ্রে ছিল পুরুষেরা, আর নারীর অবস্থান ছিল সেই কেন্দ্রের বাইরে। তাদের কল্পনা, চাহিদা, মানবিকতা সবই ছিল পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কবলে। তারা চিরকালই আধিপত্যবাদী পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা অবহেলিত, পীড়িত ত্ত লাঞ্ছিত। এই সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান যে পুরোপুরি অন্যনিভষ্টর এবং নারী সবষ্টদাই যে প্রত্যাখ্যাত অপরমাত্র তা মধ্যযু*ের একাধিক সাহিত্যে উঠে এসেছে। আমাদের ভাষা যেহেতু চেতনার চিহ্ন বহন করে, নারী এবং তার সমস্ত প্রতিশব্দের মধ্যে প্রছন্ন রয়েছে সামাজিক ত্ত সাংস্কৃতিক পরম্পরার ইঙ্গিত। সমাজ অগ্ম্প্র*তির শুরুতেই দেখা যায় যে, নারী সত্তাকে অবদমিত করে শুরু হয়েছে আধিপত্যবাদীদের শোষণ। নারীর প্রতি অমানবিক শোষণ-লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ইত্যাদি ছিল তধ্মকালীন সমাজ ব্যবস্থার এক বিশেষ ধারা, যা নারীকে পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখা যায়। এর ফলেই নারীর অবস্থান ত্ত পরিসর সংকুচিত ছিল তধ্মকালীন সময়ে।

বহুবিভাজিত সামাজিক বিন্যাসে বণষ্ট-ব*ষ্ট-লিঙ্গ*ত পাথষ্টক্য যেহেতু পীড়নের মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, সেহেতু নারীর অবস্থান সবদিক দিয়েই প্রান্তিকায়িত। ক্ষমতার বলে বলীয়ান আধিপত্যবাদী সমাজ যেভাবে নারীকে উপস্থাপিত করে, সেভাবেই তাদের অবস্থান নিণীষ্টত হয়। আলাদাভাবে তাদের কোনো অবস্থান বা পরিসর তধ্মকালীন সময়ের সমাজে ছিল না। তারা নারীদের

যেভাবে দেখতে চায় তারা সেভাবে দেখে ত্ত দেখায়। নারীকে চিরকাল হেয় প্রতিপন্ন করে আধিপত্যবাদী ব*ক্ষ তাদের আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছে। ভারতীয় সমাজের বিধি প্রচলনে মনু ফতোয়া জারি করেছিলেন *"ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মহতিক্ষ।"* [১]

এতে বোঝা যায় যে নারীদের স্বাতন্ত্র্য অধিকার তথ্মকালীন সময়ে ছিল না। ইহকাল ত্ত পরকালে পুরুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপস্থাপিকা হত্তয়া ছাড়া নারীর আর অন্য কোনো ভূমিকা সমাজে ছিল না পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়। আধিপত্যবাদী পুরুষ কেন্দ্রিকতার সমাজে নারী মূলত শোষিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, এককথায় প্রান্তিকায়িত। আধিপত্যবাদী শোষণের দাপটে নারীর কোনো স্বতন্ত্র ইতিহাস বা স্বাভাবিক সং*তি পযক্ষন্ত ছিল না। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ত্ত অথক্ষনৈতিক সবক্ষক্ষেত্রেই নারীর অবস্থানের ভিন্নতা রয়েছে। ফলে আধিপত্যবাদী ক্ষমতার লেলিহান শিখায় তারা চিরকাল জ্বলে-পুড়ে মরে। এর বিরুদ্ধে তাদের ভাষা কখনো প্রতিবাদে মুখর হয়ে ত্তঠে না। পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতার আধিপত্যে নারীর অবস্থান যে প্রান্তিকায়িত, তাদের ভাষা যে কখনো প্রতিবাদের স্বরে ধ্বনিত হয়ে ত্তঠে না, তা মধ্যযু*ের একাধিক সাহিত্যে উঠে এসেছে। বাংলা সাহিত্য যেহেতু ভারতীয় চেতনার উত্তরাধিকার বহন করে, সেই ভারতীয় সাহিত্যে মহাশ্বেতা দেবী এক ব্যতিক্রমী লেখক। মহাশ্বেতা দেবী ব্যক্তি হিসেবে নারী হলেত্ত কিন্তু সে অথেক্ষ তিনি নারীবাদী লেখিকা হিসেবে প্রচারিত নন। কারন মহিলা লেখকেরা সচরাচর যেভাবে *হক্ষস্থ্য জীবন, মধ্যবিত্ত জীবন পরিসর, নর-নারীর সম্পকক্ষ এসব নিয়েই লিখে থাকেন, ব্যতিক্রম দু'একটি থাকলেত্ত মহাশ্বেতা দেবী স্বতন্ত্র ঘরানার লেখক। মধ্যবিত্ত মদিরতার বাইরে লোক জীবনের বিস্তৃত পরিসরকে যেভাবে বিষয় করেছেন লেখক মহাশ্বেতা দেবী, যেভাবে নিজে ঘুরে ঘুরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, পুথি-পত্র ঘেঁটে ইতিহাসের তথ্যসংগ্রহ করেছেন সেটা একজন মহিলা লেখকের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। মহাশ্বেতা দেবী পুরুষ লেখকদের মতই তাঁর রচনার বিষয় বস্তুকে শানিত করে তুলে ধরেছেন পাঠক দরবারে।

সমালোচক সুতপা ভট্টাচাযেক্ষর প্রণিধান মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযো*্য—

“মহাশ্বেতা জোর দেন অত্যাচারিতের প্রতিবাদের উপর, ক্রোধের উপর আর অধিকাংশ লেখাতেই সেই প্রতিবাদে সেই ক্রোধে মেয়েরাত্ত দেদীপ্যমান। মেয়েদের ইতিহাস লেখেনি তিনি, যেমনটি চেয়েছিলেন জ্যোতিমক্ষ্ময়ী দেবী, কিন্তু ইতিহাসে মেয়েদের স্থান যে আদৌ স্বল্প নয়, মহাশ্বেতা দেবী নানান পটভূমিতে নানাভাবে তা তুলে ধরেছেন। কোনো পুরুষ লেখক মেয়েদের এই সক্রিয় ভূমিকার কথা এমন ভাবে বলেন নি, বলবেন ত্ত না।” [২]

মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে নারী পরিসর বা অবস্থান অপর সত্তার দ্বারা অবদমিত। তারা সমাজের দ্বারা অথক্ষ্ঞধ্ম লিঙ্গ*ত বিভাজনের দ্বারা পীড়িত, লাঞ্ছিত ত্ত অবদমিত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা নারীরা যু* যু* ধরেই শোষিত-বঞ্চিত। মহাশ্বেতা দেবী মধ্যযু*ীয় প্রেক্ষাপটের আধারে তাঁর বেশির ভা* উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলিকে *ড়ে তুলেছেন। কারণ নারীর অবস্থান যে কোনো যু*েই বদলায় না, তার সাক্ষ্য হিসেবে উঠে এসেছে মহাশ্বেতা দেবীর লেখনীর মাধ্যমে। মহাশ্বেতা দেবীর বেশিরভা* উপন্যাসেই নারী চরিত্রের নানা পটপরিবক্তটনের পরিচয় পাত্তয়া যায়। আর এর মধ্য দিয়ে তিনি সমাজ, জীবন ত্ত ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাদের নতুন রূপে আপন হৃদয় রসে জারিত করে *ড়ে তোলেন। তাই তার উপন্যাসের চরিত্ররা বেশিরভা* ক্ষেত্রে সময়েরই বাহন হয়ে ত্তঠে। কারন সময়ই তাদের সৃষ্টি করে। দেবেশ রায়ের মন্তব্যটি এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পূণক্ষ্ট—

“সমাজ, সময় আর ইতিহাসধৃত ব্যক্তিমানুষ হচ্ছে উপন্যাসের অনিষ্ট।... সময়ের দায় ট্মপন্যাসিককে মানতে হয়। সময়ের পাককেত্ত ট্মপন্যাসিক এড়াতে চান। কারণ তিনি পৌঁছতে চান ব্যাক্তি মানুষের কাছে। সেই ব্যক্তি মানুষ সময়ে অন্বিত, হয়ত বা সময়ের পাকচক্রে বাঁধা। তার কাছে পৌঁছতে ট্মপন্যাসিককে হাজার পথ খুঁড়তে হয়।” [৩]

অথষ্টাধ্ম এই ব্যক্তি মানুষই মহাশ্বেতা দেবীর কলমের লেখায় স্থান করে নিয়েছে। আর তাদের জীবনের অবস্থা ত্ত অবস্থান দেখানোর জন্যই মহাশ্বেতা দেবী আধুনিক যু* দাঁড়িয়ে ত্ত ছুটে চলে *েছেন মধ্যযু*ের সময়-পরিসরে। কারন তিনি তাঁর লেখনীর স্পশেষ্ট মধ্যযু*ের সময়-পরিসরকে আধুনিক যু* উন্নীত করে তুলেছেন। তিনি তাই তাঁর লেখায় বেশিরভা* ক্ষেত্রেই অন্তেবাসী প্রান্তিকায়িত মানুষের কথাকে তুলে ধরেছেন। সাহিত্যে নারীর অবস্থা প্রসঙ্গে সমালোচক তপোধীর ভট্টাচাযষ্টবলেছেন—

*"প্রান্তিকায়িত নারী সমাজের প্রেক্ষণ-জাত লোকসাহিত্য যখন ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের কৃষ্মকৌশলে রূপান্তরিত হলো অথষ্টাধ্ম পরিবর্ত্তিত বাস্তবের দাবিতে আধিপত্যবাদী ব*ষ্টযখন নারী পুরোহিতদের তৈরি ব্রত কথা, লোককথা, লোকপুরাণ ইত্যাদিকে পরিশুদ্ধ করে মঙ্গলকাব্য ধারার *োড়াপত্তন করছিল-ফুল্লরা,লহনা, বেহুলা, রঞ্জাবতীর মতো নতুন নারীদের আমরা পেলাম কিন্তু তাদের পাঠত্ত পিতৃতন্ত্রের দ্বারা সংশোধিত; এইজন্যে নারীর উচ্চারণে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য থাকলেত্ত তারা শেষ পযষ্টন্ত উপগ্রহের মতো গ্রহের নিয়ন্তা অভিকষষ্টমেনে নিয়েছে। মধ্যযু*ের সামন্ততান্ত্রিক বদ্ধ সমাজে তাঁদের পক্ষে খুব বেশি দূরে যাত্তয়া সম্ভব ত্ত ছিল না। আমরা একথা মেনে নিয়েত্ত, লক্ষ করতে পারি শুধু তাদের আচরণ ত্ত বয়ানের অন্তবষ্টর্ত্তী সম্ভাব্য সংকেত গুলি পড়তে পারি শব্দ মধ্যবর্ত্তী নৈঃশব্দ্যের বাঙ্ময় পরিসরের তাধ্মপযষ্ট।"*[৪]

অথষ্টাধ্ম নারীর জীবন পিতৃতন্ত্রের দ্বারা যু* যু* ধরেই পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তাদের কোনো সময়েই স্বাধীনসত্তা ছিল না, তার পরিচয় পাত্তয়া যায় মধ্যযু*ের মঙ্গলকাব্যে নারী চরিত্রগুলির মধ্যে।

তাই মহাশ্বেতা দেবী বণষ্ট-ব*ষ্ট-লিঙ্গ*ত ভাবে যারা শোষণের, অপমানের, পীড়ণের ফলে অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ তিনি সেইসব সবষ্টহারাদের সমস্যা তাদের জীবনযাত্রার সমস্যার কথাই শুধু বলেন না, সেই সঙ্গে তাদের সমস্যা,

সমাধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টাত্ত করেন। শবর,মুণ্ডা,লোধা-সহ অরণ্যচারী মানুষদের কথা যেমন লিখেছেন, তেমনি তাঁর আখ্যান বিশ্বে অস্থির সময়ের বয়ানের পাশাপাশি উঠে এসেছে নারীর সামাজিক অবস্থানের চিত্রটিত্ত। স্রোতস্বিনীর মত বয়ে *ছে কাহিনির অভ্যন্তরে নারীর পরিসর ত্ত তার প্রান্তিকায়িক অবস্থানের স্বরূপ। কারন মহাশ্বেতা দেবী জানেন যে ক্ষমতা বা প্রতাপের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি প্রান্তিকায়িত হচ্ছে নারীরা। নারীরা প্রতিনিয়তই লিঙ্গ বৈষম্যের চাপে অবদমিত। নারীরা যে যু* যু* ধরেই পিতৃতন্ত্রের আধিপত্যে বন্দী তার পরিচয়ত্ত মহাশ্বেতা দেবী ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাঁর রচনায় তুলে ধরেছেন। নারীর এই অবস্থান যে কোনো যু*, কোনো কালে পাল্টায় না, যু*-যু* ধরেই নারী নিষ্পেষিত, শোষিত, লাঞ্ছিত এই অবস্থাটাকেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মানুষেরা চিরকাল লালন-পালন করে আসছেন। সমাজ ব্যবস্থার এই স্বরপটি তুলে ধরার জন্যই মহাশ্বেতা দেবী আধুনিক যু*র প্রেক্ষাপটে মধ্যযু*র সময়কে তুলে ধরে নারীর বাস্তবিক অবস্থান ত্ত পরিসরকে তুলে ধরেছেন। সময়ের পরিবত্তন্টনের সাথে সাথে যে পীড়নের হাতিয়ারেরত্ত যে কোনো পরিবত্তন্টন হয় না, তার চিত্রত্ত মহাশ্বেতা দেবী তাঁর একাধিক উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

'আঁধারমানিক' উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী অষ্টাদশ শতকের বি*ষ্টর আক্রমণে বিধ্বস্ত বাংলার ছবির পাশাপাশি তথ্মকালীন সময়ে নারীর পরিসরের দিকটিকেত্ত স্পষ্ট করে তুলেছেন। এই নারীর পরিসর যে প্রান্তিকায়িত তা আলোচ্য উপন্যাসে বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। কারন তথ্মকালীন সময়ের নারীরা ছিল সমাজের দিক থেকে শুধু পীড়নের হাতিয়ার, তাই নারীর অবস্থা ছিল বিপন্ন। শোষণ, লাঞ্ছনা-নিপীড়নের বস্তু হিসেবেই সেসময় নারীকে দেখা হত। ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসনে নারীর পরিসরত্ত যে ছিল প্রান্তিকায়িত তা আলোচ্য উপন্যাসে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। সামন্ততন্ত্রের ক্ষমতার দাপটে সাধারণ মানুষের জীবন দুবিষ্টষহ হয়ে উঠেছিল। এই অবমাননা, লাঞ্ছনা ত্ত পীড়নের ইতিহাস অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভা* এসে

এক বিরাট আকার ধারণ করেছিল, ফলে সামাজিক জীবনে মেয়েদের অবস্থাত্ত বিপযষ্টস্ত হয়ে উঠেছিল।

আলোচ্য উপন্যাসে সামাজিক জীবনে মহাশ্বেতা দেবী দেখিয়েছেন কীভাবে উচ্চবণেষ্টর হিন্দু ত্ত পুরুষের আধিপত্যে প্রান্তিকায়িত পরিসরে অবস্থান করে জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে নারীরা। ট্মপন্যাসিক একের পর এক নারীর জীবন পযষ্টালোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে নারীরা সামাজিক পরিস্থিতির শিকার, তাদের নিয়ে চলেছে দাস-ব্যবসা এমন কী সাংসারিক জীবনেত্ত তাদের কোনোত্ত নিরাপত্তা নেই; যেকোনত্ত মুহূত্তেষ্ট তাদের ত্তপর নেমে আসে শাস্তির বিধান। ফলে পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর জীবনের কোনো মূল্য নেই; এই সব নারীরা জানে— *''দ্বাদশ বঙ্গাব্দে বাংলার মেয়ের সামনে অন্ধকার *াঢ় নিশ্চিদ্র, সীমাহীন।... মেয়েদের চুন খসলে ত্যা* করবার, পতিত করবার, হাজরটা বিধি আছে।... যারাই আপত্তি করে, আপত্তি জানায়, তাদের *তি হয় তীথষ্টস্থানের বাজারে। তাদের বেশ্যা হতে হয়, ভিখিরী হতে হয়।... এর চেয়ে বেশি সম্মান দ্বাদশ বঙ্গাব্দের বাংলাদেশ বাংলার মেয়েদের দেয়নি।''*[৫]

অথষ্টাধ্ম মধ্যযু*ীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারীর যে কোনো স্বাধীনতা ছিল না, আর তারা যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা নি*ৃহীত তার পরিচয়টি স্পষ্ট হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসের মধ্যে। মহাশ্বেতা দেবী আধুনিক যু* দাঁড়িয়েত্ত মধ্যযু*ের প্রেক্ষাপটে অতীত ত্ত বতষ্টমানের যো*সূত্রে আধুনিক কালের সময়কে ধরতে চেয়েছেন 'আঁধারমানিক' উপন্যাসের মধ্যে। 'সময়' যেভাবে আলোচ্য উপন্যাসে উঠে এসেছে তার মধ্য দিয়ে সমাজের আধিপত্যবাদী ক্ষমতাবানদের দ্বারা শোষিত, লাঞ্ছিত নারীর বিপন্নতার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। ট্মপন্যাসিক মহাশ্বতা দেবী দেখিয়েছেন যে অনূঢ়া কুলীন কন্যার জ্বালা— *"কুলীন কন্যার দুঃখে রাঢ়েবঙ্গে বাঁশঝাড়ে শন্‌শন্ শব্দে বাতাস কাঁদে।''*[৬] নারীর এই অবস্থাই মহাশ্বেতা দেবীর ইতিহাস রচনার অন্যতম প্রধান উপকরণ। এই 'কুলীন' মেয়েরা বা নারীরা যে

ব্রাহ্মণ্য শাসনের নিয়মে নিজেদের মুক্ত করতে পারে নি। কারন গ্রামে ব্রাহ্মণই ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তাঁর কথাই শেষ কথা। ফলে তারা সমাজ বিধানের নামে নিজেদের আধিপত্যকেই কায়েম রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের সমাজ বিধান তথ্যকালীন সময়ে নারী অবস্থার বিপন্নতাকেই ব্যক্ত করে— *"... মেয়েদের বিষয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বড়ই কঠোর। মেয়েদের আচরণে এতটুকু এদিক-ওদিক দেখলেই 'শেল শেল' রব তোলেন। কথায় কথায় দম্ভ করে বলেন, 'আমার মেয়ে বা নাতনী হলে এখনি শিয়ে বিষ দিতাম, বিষ দিতে মায়া হলে নবদ্বীপে ফেলে দিয়ে আসতাম। মাথা মুড়িয়ে ভিক্ষের ভাত খেত।'"*[৭]

সমাজে নানা আচার-সবর্ণস্বতার নাম করে মেয়েদের/ নারীর অবস্থান বা পরিসরকে প্রান্তিকায়িত করে রাখা হয়েছে। কুলীন নারীর কান্নায় ও তাদের বিপন্নতার অবস্থা দেখে বনের পশু-পাখি, নদীর জল পর্যন্ত কাঁদে— *"কুলীন কন্যার জন্ম থেকে মৃত্যু একটানা অশ্রুজলে লেখা থাকে। কুলীন কন্যার দুঃখে বনের পশু-পাখি কাঁদে নদীর জল কাঁদে।"*[৮]

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি যেমন ঘটেছিল তেমনি এরই পশাপাশি নারীর ক্ষেত্রে তা দুঃখের কারন হয়ে উঠেছিল। কারন *"কুলীন ঘরের পুরুষ যথেচ্ছ বিয়ে করে, কিন্তু বউ আনে কম, কেন না কুলীন সন্তানের আশের নৌকায় পারামাণিক যায়, *ঙ্গাতীরে গ্রামে গ্রামে সম্বন্ধ করে। পাছে নৌকোয় বর আসে, কি রাঢ়ে কি বঙ্গে, কি *ঙ্গাতীরে কি বড়*াঙ্গের কুলে, কুলীনের মেয়ের কিংবদন্তী কেউ ফিরে লেখে না। ... কুলীন কন্যার দুঃখ কোনও দিন ঘোচে না।"*[৯]

অথর্ঞ্চ পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যে নারীর অবস্থার কোনো পরিবর্তন নেই। তাদের অবস্থা শুধু পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তাই আলোচ্য উপন্যাসে লক্ষ করা যায় যে, আধিপত্যবাদী সমাজের শাসনে তিনটি মেয়ের আত্মহত্যার আখ্যান রচিত হয়েছে। উপন্যাসের আখ্যানে লক্ষ করা যায়

যে, নরপতির তেরো বছরের বোন পূণষ্ট শশীকে চড়কের সময় বাদিয়ারা ধরে নিয়ে ি*য়েছিল আর একদিন পর ফেরত দেয়। এর ফলে সমাজ বিধান দিয়েছিল যে, তার জিভে তপ্ত ঘি ঢালা হবে। কিন্তু ভয়ে সে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। অথষ্টাধ্ম নারীর জীবন যে তধ্মকালীন সময়ে বিপন্ন ছিল তার পরিচয়ই স্পষ্ট হয়ে ত্তঠে আলোচ্য উপন্যাসের মধ্যে—*"যেমন আচাজ্জি, তেমনি তার বিধান। হা রে পুনি জিভে তপ্ত ঘি ঢাললে বাঁচে কে ত্ত? এমনি করে বিচার হয় সে শুদ্ধ কি না? ভয়ে সে আমার জলে ঝাঁপ দিলে,... পুনির জেবনটা যেন ব্রেথায় *েল।"*[১০]

এই একই রকম ঘটনার আবতষ্টন লক্ষ করা যায় বড়ো আচাযেষ্টর আট বছরের মেয়ে নিমষ্টলার ক্ষেত্রে। নিমষ্টলাকে বি*ষ্টরা ছুয়েছে বলে সমাজ বহিভূষ্টত করে নবদ্বীপে নিবষ্টাসনের হুকুম জারি করা হয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার এহেন বিধান নারীর বিপন্নতার অবস্থাকেই সূচিত করে। বিশালাক্ষীর উক্তির মধ্যদিয়েত্ত নারীর বিপন্নতার দিক্‌টিই উদ্‌ভাসিত হয়ে ত্তঠে— *"বেটাছেলেদের কাজ শুধু মেয়েদের পতিত করা, ত্যা* করা, দোষ ধরা, শাস্তি দেত্তয়া, মেয়েদের আ*লে রাখা, সামলে রাখা, সেটা তাদের কাজ নয়?"*[১১]

নিমষ্টলার মতো রামাই বা*দির স্ত্রী পারীকে ত্ত পতিত করা হয়েছিল। কারন পারী বি*ষ্ট কতৃষ্টক ধষিষ্টত হলে সমাজের বিচারে তাকে পতিত করা হয়েছিল এবং রামাইকে নিদেষ্টশ দেত্তয়া হয় স্ত্রীকে ত্যা* করার জন্য। কিন্তু রামাই সমাজের বিধানকে মেনে নেয় নি। সে তাঁর স্ত্রীকে ত্যা* করতে চায় নি। সে বলে—

"পারীকে ত্যা করতে পারব না। দরকার হয় গ্রাম ছেড়ে যাব। দরকার হয় ভিন*ায়েঁ ি*য়ে কলমাপড়ে সেখপাড়ায় ঘর বাঁধব। পারীকে ছাড়তে পারব না।"*[১২] রামাইয়ের এই বক্তব্যই যেন আধিপত্যবাদী শাসনের শিকলকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে—

*"তাদের ব্রাহ্মণ্যত্বকে যেন লজ্জা দিয়ে *েল রামাই। যেন বুঝয়ে দিয়ে *েল সবচেয়ে ত্তপরে, সবার চেয়ে বড় মনুষ্যত্ব।"*[১৩] রামাই বুঝিয়ে দিয়েছিল যে

তাঁর কাছে তাঁর স্ত্রীর সম্মান কতটুকু। কারন রামাই তাঁর স্ত্রীকে এতটাই ভালোবাসত যে স্ত্রীর জন্য নিজের জাত-ধমষ্ট ছেড়ে দিয়ে আন-জাত-এ ি*য়ে স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করবে। রামাইয়ের একথাই যেন সামাজিক অবমানবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী স্বর হয়ে উঠেছে। রামাইয়ের এই প্রতিবাদ যেন বিশালাক্ষীকে ত্ত বিস্মিত করেছিল, কারণ—

"...এতদিন যে কথা তিনি কোথাত্ত শোনেন নি, আজ সেই কথা শুনলেন। বাংলাদেশে একটি পুরুষ বলেছে স্ত্রী যদি নিদোষ্টষ হয়ে থাকে তবে তাকে সে ত্যা করবেনা।"*[১৪]

রামাই পারীর জন্য সমাজ-জাত-ধমষ্টকে ত্যা* করতে চেয়েছিল। চেয়েছিল সমাজের অনুশাসন-বিধানকে অস্বীকার করে পারীকে নিয়ে অন্য গ্রামে ি*য়ে, অন্য ধমেষ্ট দীক্ষিত হয়ে নতুন করে ঘর বাঁধতে। শেষ পযষ্টন্ত পারীর আত্মহত্যার জন্য সেই স্বপ্নত্ত বাস্তবে রূপ নিল না। আচাযষ্ট মশাইয়ে উক্তির মধ্য দিয়েই তথ্মকালীন সময়ে মেয়েদের বিপন্নতার দিকটি স্পষ্ট হয়ে ত্তঠে—

"মেয়েদের জীবনের আবার দাম আছে না কি? মেয়েদের জন্যে ধমষ্টছাড়তে চায় এমন বোকাত্ত কি বাংলাদেশে আর একটি আছে?"[১৫]

আর তথ্মকালীন সময়ে মেয়েরা যদি কোনো কেলেঙ্কারি করলে তাদের বিষ দিয়ে মেরে ফেলা হত তারত্ত পরিচয় পাত্তয়া যায় আলোচ্য উপন্যাসের মধ্যে—*"বিষ খাইয়ে, অথবা খেতে বাধ্য করবার ফলে-কয়েক বছর বাদে বাদেই বিধবা, কুলীন কুমারী দুটি- একটি মারা যান, এ সবাই জানে।"*[১৬]

শেষ পযষ্টন্ত সমাজে পারীর মৃত্যুতে রামাই বুঝিয়ে দিয়ে ে*ল— *"যে জাতের, যে ধমেষ্টর এমন শাসন, যার ভয়ে আমি মরলাম, মহাপাপী হলাম, তারে তুমি ছেড়ে যাত্ত।"*[১৭]

কিন্তু রামাই পরবতষ্টীতে ধমষ্টান্তরিত হয়ে তাঁর প্রতিবাদকে সে স্তিমিত হতে দেয়নি— *"একা নিরক্ষর রামাই বা*দী জানিয়ে দিয়ে ে*ল ত্তদিকে যতই কৃষ্ণচন্দ্রের*

*সভায় বসে ভারতচন্দ্র কাব্য লিখুন, পশ্চিমে, বিলেতের বাজারে, বেং*ল সিল্কের বাজার বড় হতে থাকুক, ব্যাণ্ডেলের *ীজেস্টয় বসে ফাদার আন্তোনিত্ত বংলাদেশের বিপযস্টয় দেখে ডায়েরীর পাতা ভরিয়ে ফেলুক, আর একদিকে জ*ধ্মপতি, জ*ধ্ম শেঠ, মীরজাফর, বারত্তয়েলরা টাকা আরত্ত টাকার স্বপ্ন দেখুক, আসলে সবস্টত্র পচ ধরে *েছে, সবস্টত্র।''*[১৮]

মহাশ্বেতা দেবী এভাবেই রামাই বা*দির মধ্য দিয়ে তধ্মকালীন সময়ের সমাজ-অসাঢ়তা-শূন্যতার চিত্রকে উপন্যাসের মধ্যে দক্ষ শিল্পীর মত চিত্রিত করেছেন।

আলোচ্য উপন্যাসে নিমস্টলার পরিণতি যেন নারীর বিপন্নতার অবস্থাকেই চিত্রিত করে। কারন যু* যু* ধরে নারীরা যে ভো*ের সামগ্ধ্রী ত্ত পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এই কথাই আলোচ্য উপন্যাসে জানা যায়। উপন্যাসে লক্ষ করা যায় যে, নিমস্টলার স্বামী দুলাল তাকে 'বাঁদীহাটে' বিক্রি করে দিয়েই তাঁর স্বামী ক্ষান্ত হয় নি, নিমস্টলাকে 'কুলটা' বলে সমাজে তা রটিয়ে দেয়। ফলে—

*"বিসজস্টনের প্রতিমার মতো নিমস্টলা অন্ধকার থেকে *াঢ়তর অন্ধকারেই ভেসে চলছিল। ভা*্যের স্রোতকে বাধা দেবার কথা তার চিন্তাতেত্ত আসে নি। দ্বাদশ বঙ্গাদের বাংলার মেয়ে হয়ে জন্মেছে যখন তখন ভা*্য এবং সমাজ তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে একথা তার রক্তে রক্তে জানা হয়ে *িয়েছিল।''*[১৯]

কারন নিমস্টলা জানে যে সমাজ তাঁকে আর কখনো তাঁর আ*ের জায়*ায় ফিরে আসতে দেবে না, দেবে না নূন্যতম সামাজিক সম্মান টুকুত্ত। তাই সে জানে—

"ভা্য এবং সমাজ কখনত্ত তাকে সোনা রুপো নিয়ে কুলীনের সঙ্গে বিয়ে দেবে, কখনত্ত যে স্বামীকে চোখে পযস্টন্ত দেখে নি, তারই চিতায় চড়িয়ে 'তুমি সতী' বলে ড্যাং ড্যাং করে ঢাক-ঢোল বাজাবে, কখনত্ত ব*স্ত্রী তোমায় ছুঁয়েছে বলে ন্যাকড়া পরিয়ে গ্ধ্রাম থেকে বের করে দেবে, আবার কখনত্ত পঞ্চাশ, এক আকস্টটি*

তঙ্কার লোভে তোমাকে বেচে দেবে।''[২০]

মহাশ্বেতা দেবী এভাবেই দ্বাদশ বঙ্গাব্দের নারীর বিপন্নতার কথাকে তুলে ধরেছেন আলোচ্য উপন্যাসে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক সুতপা ভট্টাচাযেক্ষর মন্তব্যটি প্রনিধানযো*্য—

"এভাবেই মহাশ্বেতা দ্বাদশ বঙ্গাব্দের মেয়েদের ইতিহাস লিখে দিয়েছেন 'আঁধারমানিক' উপন্যাসে। না, শুধু ইতিহাসে মেয়েদের স্থান নয়, মেয়েদেরই ইতিহাস।''[২১]

মহাশ্বেতা দেবী আধুনিক যুগে* বাস করে ত্ত দ্বাদশ বঙ্গাব্দের মেয়েদের অবস্থানকে নিপুণতার সঙ্গে চিত্রিত করার মধ্য দিয়ে নারীর বিপন্নতার দিকটি বিশেষভাবে উপন্যাসে প্রতিফলিত করেছেন। কারন তথ্মকালীন সময়ে নারীরা যে পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যে প্রান্তিকায়িত হয়ে পড়েছিল তারত্ত চিত্র পাত্তয়া যায় উপন্যাসের মধ্যে। পুরুষেরা একশোটা বিয়ে করে, উপপত্নী নিয়ে সমাজে বাস করতে পারে। কিন্তু— *"মেয়েদের পান থেকে চুন খসলে ত্যা* করবার পতিত করবার, হাজারটা বিধি আছে।''* [২২]

মহাশ্বেতা দেবী নারীদের নিয়ে দ্বাদশ বঙ্গাব্দের প্রেক্ষাপটে যে কথাগুলো বলেছেন, তা তো বতক্তমান সময়ের ক্ষেত্রেত্ত প্রযোজ্য। কারন—

"সমাজের চোখে তারা বড়ই নিকৃষ্ট। অথচ, মজা এমন, তেমন তেমন সময়ে সমাজের চোখে ত্যাগের, সহ্যের, ধৈযেক্ষর, কষ্ট সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল আদশক্ষ তুলে ধরবার দায়িত্ব এই কয়েক লক্ষ নিকৃষ্ট জীবের, আর কারত্ত নয়। স্বামী অথবা পিতা, তাদের কুলে পুণ্য এনে দেবার দায়িত্বত্ত মেয়েদেরই। তাই তারা একাদশীতে বুক ফেটে মরবে, সাত বছরের মেয়েত্ত প্রয়োজনে চিতায় পুড়ে মরবে।''[২৩]

নিমক্ষলা সমাজের অনুশাসন সম্পকেক্ষ অবহিত ছিল যে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অনুশাসনকে অস্বীকার করলেত্ত নারীর অবস্থা প্রান্তিকায়িত, আবার

সমাজের অনুশাসনকে স্বীকার করলেত্ত নারীরা বঞ্চনার হাত থেকে রেহাই পেত না। তাই সে সমাজের আধিপত্যবাদী ক্ষমতার সম্পকেক্ট জানত—

*"যারাই আপত্তি করে, আপত্তি জানায়, তাদের *তি হয় তীথক্ষস্থানের বাজারে। তাদের বেশ্যা হতে হয়, ভিখিরী হতে হয়। যারা আপত্তি করে নি, স্বশ্রেণীর আত্মীয় স্বজনের হাতেই অত্যাচারিত, ধষিক্ষত, নি*হীত হয়েছে, তাদের বেলায়ত্ত হাতে আধখানা নারকেলের মালা আর পরনে ন্যাকড়া নিয়ে নবদ্বীপ, বক্রেশ্বর বা শ্রীক্ষেত্রের পথের ধারে ভিক্ষে করবার বিধান। এর চেয়ে বেশি সম্মান দ্বাদশ বঙ্গাব্দের বাংলাদেশ বাংলার মেয়েদের দেয়নি।"*[২৪]

নারীর অবস্থার সম্পকেক্ট নিমক্ষলার এ ধারণা তত্মকালীন সময়ে নারীর বিপন্নতার কথাকেই স্পষ্ট করে তোলে।

মহাশ্বেতা দেবী আলোচ্য উপন্যাসে জ*ধ্মপতি চরিত্রটির মধ্যদিয়ে উচ্চবর্গ*ক্ষর ভো*-লালসার শিকার যে নারীকেই হতে হত, আর এই সকল মানুষদের জন্যই যে ক্রীতদাসী প্রথা, নানা জায়*ায় ছড়িয়ে আছে- মানব ইতিহাসের বিপন্নতার এই দিকগুলিকে দক্ষ ডুবুরীর মত তুলে ধরেছেন। সুরাটি বণিকের কাছ থেকে নিমক্ষলাকে উদ্ধারের যে প্রচেষ্টা কাশীশ্বর করেছেন এবং শেষ পযক্ষন্ত নিমক্ষলার আত্মহত্যার পথ বেছে নেত্তয়া- নারীর বিপন্ন অবস্থার চিত্রকেই স্পষ্টতা দেয়। তাই উপন্যাসে ত্ত এই বিপন্ন সময়ের প্রসঙ্গত্ত উঠে আসে—

*"রাজকবি আর লোককবি দুজনের একজন ত্ত বোঝেননি সবচেয়ে বড় পাপ হল মানুষ হয়ে মানুষকে নিষ্পেষণ করা, আর সে পাপ চিরদিন হয়ে এসেছে, চিরদিন হয়ে আসবে। ... মেয়েরা যে শুধু পণ্যশুল্ক নয়, তাদের নিয়ে বারবার শুধু ছিনিমিনি খেলতে পার না তুমি, একথা কে বলবে? ... *ঙ্গেয়বঙ্গের মেয়েরা ধষিক্ষত, অবমানিত, লাঞ্ছিত। কিন্তু মেয়েদের লাঞ্ছনার ব্যবস্থা ব*ক্ষীরা করবার আর্গেই তো সমাজই করে রেখেছিল। একটি নতুন কাপড়ের চেয়ে অনেক কম দামে একটি মেয়েকে কেনা যেত, এঁটো মাটির হাঁড়ির মতই অবহেলে ত্যা* করা যেত*

তাদের।''[২৫]

মহাশ্বেতা দেবী মধ্যযু*ের প্রেক্ষাপটে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় লিঙ্গ*ত পাথক্যের জন্য নারীরা যে প্রান্তিকায়িত এবং তারা পীড়িত-শোষিত-লাঞ্ছিত উচ্চব*ক্ষীয় আধিপত্যবাদীদের দ্বারা, সে সকল ঘটনার সমাবেশেই উপন্যাসের আখ্যান ভা* *ড়ে তুলে ধরেছেন। তিনটি মেয়ের আত্মহত্যার উপাখ্যানে রচিত 'আঁধারমানিক' উপন্যাস। এই তিনটি মেয়ের আত্মহত্যাই প্রমান করে দেয় যে, তারা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা চাপানো অনুশাসনকে মেনে নেয় নি। তারা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই সমাজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে যায়। সময়টি মধ্যযু* হলেও ঔপন্যাসিক আলোচ্য উপন্যাসের মধ্য দিয়ে মধ্যযু*ীয় সময়কে অতিক্রম করে আধুনিক যু*কে ধরতে চেয়েছেন। যার জন্য তাঁর উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি ভাষা খুঁজে পেয়েছে। পেরেছে পুরোনো ঐতিহ্য ও সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। তাই তারা আত্মহত্যার মধ্যদিয়ে মধ্যযু*ীয় ঐতিহ্য ও সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে যায়। মহাশ্বেতা দেবীর এই উপন্যাস রচনার প্রসঙ্গে সুতপা ভট্টাচাযক্তবলেছেন—

*"আঠারো শতকের রাজনৈতিক ইতিহাস, বি*ক্ত আক্রমণ আর বণিকের মানদণ্ড ক্রমে রাজদণ্ডের দিকে এ*িয়ে যাওয়া এসব থাকলেও এ উপন্যাসে মেয়েদের জীবনের অন্ধকার দিকগুলিই বেশি করে নজরে আসে।... মেয়েদের জীবনের অন্ধকার দিকটিই সেখানে প্রধান, শুধু মার খাওয়া শুধু মরে যাওয়াই সেখানে মেয়েদের নিয়তি। না, নিরাশাতে কথাশেষ মহাশ্বেতার ধরন নয়, তিনি দেখাতে চান প্রতিবাদ, প্রতিশোধ, উত্তরণ। মেয়েদের ক্ষমতাহীনতা নয়, বরং ক্ষমতার দিকই তুলে ধরতে চেয়েছেন মহাশ্বেতা, হতে পারে প্রায়শই তা ক্ষমতার অন্ধকার দিক।''*[২৬]

অথক্তাধ্ম মহাশ্বেতা দেবী আলোচ্য উপন্যাসে মধ্যযু*ের সময় ও পরিসরের প্রেক্ষাপটে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারীর বিপন্নতার অবস্থাকেই তুলে

ধরেছেন। ফলে দ্বাদশ বঙ্গাব্দের নারীর অবস্থা যে প্রান্তিকায়িত ছিল এবং নারীর চিন্তা-চেতনা, ভাষা-সবই যে পিতৃতন্ত্রের অধীন সেদিকটিত্ত আলোচ্য উপন্যাসে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বণিষ্টত হয়েছে।

'কবি বন্দ্যঘটী *াঞির জীবন ত্ত মৃত্যু' উপন্যাসে ষোড়শ শতকের নারীর বিপন্নতার দিকটিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মহাশ্বেতা দেবী আলোচ্য উপন্যাসটির সময় হিসেবে মধ্যযু*ের ইতিহাসকে প্রেক্ষাপট হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কারন প্রাক্‌চৈতন্য মধ্যযু* থেকেই বাংলা সাহিত্য পূণষ্টরূপে বিকশিত হতে থাকে নতুন নতুন সৃষ্টির মধ্যদিয়ে। ফলে চৈতন্যযু* হয়ে ত্তঠে বাংলা সাহিত্যের স্বণষ্টযু*। এই সময় শ্রীচৈতন্য দেবের প্রভাবে সমাজের সবষ্টস্তরের মানুষ অথষ্টধ্ম জাতি,ধমষ্ট,বণষ্ট নিবিষ্টশেষে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ভুলে সমাজের একাসনে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এরই মধ্য দিয়ে তধ্মকালীন সময়ের নারীর প্রান্তিকায়িত অবস্থানের স্বরূপটিত্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। মহাশ্বেতা দেবী আলোচ্য উপন্যাসে দক্ষ শিল্পীর মতো অল্প পরিসরে হলেত্ত মধ্যযু*ের সামন্তান্ত্রিক আধিপত্যে নারীর বিপন্নতার পরিসরকে তুলে ধরেছেন।

মহাশ্বেতা দেবী ইতিহাস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে উপন্যাসের অবয়ব *ঠন করেছিলেন বলেই, তাঁর উপন্যাসে ইতিহাসবোধ ত্ত সময়ের প্রাধান্য লক্ষ করার মধ্য দিয়ে জনজীবনের প্রান্তিক পরিসরটি উঠে এসেছে। আদিবাসী মানুষদের সাথে তাঁর *ভীর সংযো* থাকার জন্যই তাঁর উপন্যাসে স্থান পেয়েছে সবষ্টহারা, সংগ্রামী- বিপযষ্টস্ত মানুষদের লোক-চলাচলের ইতিহাস। তাই তাঁর উপন্যাসে স্থান পেয়েছে প্রান্তিকায়িত নারীর বিপযষ্টস্ত অবস্থা। মহাশ্বেতা দেবী প্রসঙ্গে নিমষ্টল ঘোষ বলেছেন—

"মধ্যবিত্ত জীবনের নানা টানাপোড়েনের মধ্যে অনেক পথ হেঁটে ক্লান্ত মহাশ্বেতা এবার আদিবাসী জীবনকে খুঁজলেন ইতিহাসের পটভূমিতে। আদিবাসী জীবন তাঁর অজানা ছিল না, এবার তাকে সম্পূণষ্ট করে জানা হল ইতিহাসে-

জীবন অভিজ্ঞতায়।''[২৭]

অথষ্টাধ্ম মহাশ্বেতা দেবী দক্ষ ডুবুরীর মত আদিবাসী সমাজ জীবনের *ভীরে ডুব দিয়ে তাদের লোকচলাচলের বিচিত্র ধরার মধ্যে নারীর পরিসরকে তুলে ধরেছেন তাঁর রচনায়। কারন তিনি নিজেই বলেছেন—

*"...সাহিত্যের দাবি জীবনের দাবির সঙ্গে যেন এক হয়ে *েল, এক হয়েই আছে আজন্ত। মানুষ হিসাবে যদি আমি সততা, প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা, প্রতিবাদে বিশ্বাসী হই, সাহিত্যে কী করে আমি অন্য কথা বলি, মুখ ফিরিয়ে থাকি-এই রকমই কোনো প্রশ্ন মনের কোনো অতল গ্%াফাইটে দা* ফেলেছিল নিরন্তর কম্পনে।''*[২৮]

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর অনেক রচনায়ই নারীর দুবষ্টল সামাজিক অবস্থান ন্ত তদ্ঘটিত কারনে নিযষ্টতন, বঞ্চনা ন্ত শোষনের বিবরণ আছে। আলোচ্য 'কবি বন্দ্যঘটী *াঞির জীবন ন্ত মৃত্যু' উপন্যাসের স্থানিক পরিসর ভীমাদল রাজ্যের মধ্য দিয়ে মধ্যযু*ীয় বাংলা তথা ভারতবযেষ্টর বিপন্ন নারীর অবস্থানকেই নিদেষ্টশিত করে। উপন্যাসটির প্রধান নারী চরিত্র হিসেবে উঠে এসেছে মাধবাচাযেষ্টর কন্যা ফুল্লরা। ফুল্লরার সঙ্গে কবি বন্দ্যঘটীর প্রেম ন্ত ঘাত-প্রতিঘাতের কাহিনির মধ্য দিয়ে ফুল্লরার পারিপাশ্বিষ্টক অবস্থানকে ঘিরে আরো অনেক ছোটো-বড়ো নারী চরিত্রের অবস্থানন্ত আলোচ্য উপন্যাসে উঠে এসেছে। ট্মপন্যাসিক এই সমস্ত চরিত্রের মুখে যেসব ভাষা যু*িয়েছেন, তার মধ্যদিয়ে এই সকল নারীর স্বতন্ত্র এক জ*ধ্ম- যা সময়ের সাথে মিলে এ*িয়ে *েছে, তারই প্রকাশ ঘটায়। মহাশ্বেতা দেবীর রচনার প্রসঙ্গে তপোধীর ভট্টাচাযেষ্টর উক্তিটি প্রণিধানযো*্য— *"সামাজিক ন্ত রাজনৈতিক মুক্তির পথ কীভাবে সংশয়ের অন্ধকারে আছন্ন সময়েন্ত মানুষ খুঁজে নেয় এবং ব্যথষ্টতায়-সফলতায় পরাজয়ে-জয়ে ব্যক্তি*ত ন্ত ব*ষ্ট*ত ইতিহাস রচনা করে- মহাশ্বেতা সেই বৃত্তান্ত পাঠকের কাছে পৌঁছে দেন।''*[২৯]

মহাশ্বেতা দেবী মধ্যযু*ীয় সমাজ- ব্যবস্থার নিরিখে পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যে উচ্চবিত্ত ন্ত নিম্নবিত্ত উভয় প্রকার শ্রেণির কাছে বিশেষ করে পুরুষের কাছে,

নারীরা যে শুধুমাত্র কামনার ত্ত ভোক্ের সামগ্ ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হত, তা উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। যার ফলে আলোচ্য 'কবি বন্দ্যঘটী *াঞির জীবন ত্ত মৃত্যু' উপন্যাসে প্রাসঙ্গিক ভাবেই উঠে এসেছে জলপাত্র, উপপত্নী, দাস-দাসী বিক্রি ত্ত দেহ ব্যবসায়ীদের কথা। উপন্যাসে লক্ষ করা যায় যে, উচ্চব*ক্ট ত্ত নিম্নবক্ের অন্ত*ক্ষিত নারীর অবস্থান প্রাতিকায়িত হলেত্ত উভয় বক্ের নারীর বিপন্নতার স্বরূপ কিন্তু একই ছিল না। রক্ষিতা বা দেহ ব্যবসায়িনী কাজে শুধুমাত্র নিম্নবক্ের নারীরাই ব্যবহৃত হত। কারন গুণা আয়ি, মাতঙ্গী, এই সকল চরিত্রের মধ্যদিয়ে সে সময়ের এই সব চিত্রগুলো স্পষ্ট হয়ে ত্তঠে। আর উচ্চবক্ের অন্ত*ক্ষিত নারীর যে চিত্র আলোচ্য উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। তাতে পারিবারিক জীবনে নারীর বিপন্নতার চিত্রটি প্রকটভাবে ধরা পড়েছে উপন্যাসের মধ্যে। এতে নারীর প্রান্তিকায়িত অবস্থানের দিকটিকেই উন্মোচিত করে। কারন উচ্চবক্ের পুরুষরা ঘরে স্ত্রী থাকলেত্ত অনেক সময় অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্কেক্ট লিপ্ত থাকত। উপন্যাসের মাধবাচার্যেক্ের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেত্ত তার জলপাত্র ছিল গুনা আয়ি। তথ্মকালীন সময়ে একজন পুরুষের অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্কক্ট থাকলেত্ত তা সমাজের চোখে কোনো লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় নি। একজন নারী হয়েত্ত ফুল্লরার মনে তার বাবার সম্পর্কেক্ট তাঁর কোনো বিরূপ মনোভাব ফুটে ত্তঠে নি, বরং তার মধ্যে এক প্রকার *বক্টবোধ ছিল। ফুল্লরার বাবার জলপাত্রটি সম্পর্কেক্ট কবি বন্দ্যঘটীর মনোভাব যে ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাতে তথ্মকালীন নিম্নবক্ের অন্ত*ক্ষিত নারী সমাজের চিত্রটিকেই উদ্ভাসিত করে তোলে—

*"... এ বৃদ্ধা শ্মশানের দূতী, প্রেতপুরীর *ণিকা পল্লীর কুটিনী, বড় অশুভ, বড় অশুচি।"*[৩০]

মহাশ্বেতা দেবী নারীর এই অবস্থান ত্ত অবস্থার বিবরণ দিয়ে তথ্মকালীন সময়ে নারীর বিপন্নতার দিকটিই স্পষ্ট করে তুলেছেন আলোচ্য উপন্যাসে। ফুল্লরা ত্ত কবি বন্দ্যঘটীর মধ্য দিয়ে তথ্মকালীন সময়ে নারী ত্ত পুরুষের সম্পর্কেক্ট নারীর

পুরুষের প্রতি অবিশ্বাসজনিত বেদনা ত্ত পুরুষের ভাবাদশষ্টহীনতার কথাই স্পষ্ট হয়ে ত্তঠে—

"পুরুষের মন... ভ্রমরের মত ফুল হতে ফুলে উড়ে উড়ে বসে।"[৩১]

ফুল্লার মধ্যদিয়ে মহাশ্বেতা দেবী তখ্মকালীন সময়ে বেনে বউদের ত্ত অসহায়তার চিত্রটিত্ত তুলে ধরেছেন উপন্যাস। কারন তখ্মকালীন সময়ে বেনে পুরুষরা ব্যবসায়ের জন্য দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ায় এবং এক সময় তারা অন্য কোনো নারীর প্রতি বশীভূত হয়। এর ফলে নিজের স্ত্রীর প্রতি তাদের কোনো কতষ্টব্য থাকে না। একপ্রকারে তারা তাদের স্ত্রীকে ভুলেই যান। ফুল্লরার কথায় তা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, যার মধ্যে দিয়ে বেনে বউদের অসহায়তার দিক্‌টি স্পষ্ট হয়ে ত্তঠে—

" ... বেনে পাড়ায় বউ ঝিয়াড়ী কোন দিকে চেয়্যে বুক বান্ধে জান না? তাদের পুরুষরা সম্বখ্মসর বিদেশে-বিদেশে ফিরে, আর যেখানে নৌকা বান্ধে সেখানে মাশ্ীরা কামাখ্যামন্ত্রে উ-দের বশ করে সভে জানে।"[৩২]

আর উপন্যাসে লক্ষ করা যায়, যে ফুল্লরার সখী রাধীর বয়স ষোল হত্তয়ার আশ্ই তাকে বিয়ে দেত্তয়া হয়, এবং ষোল বছর পূণষ্ট হত্তয়ার আশ্ই সে তাঁর স্বামীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। নারীর এহেন অবস্থার চিত্রটি চমখ্মকার ভাবে ফুটে উঠেছে উপন্যাসের মধ্যে—

*"কৃষ্ণা দ্বাদশীর চাঁদের মত তার মুখের হাসিটি মুকুলিত হতে না হতেই মুছে নিল কে। এখন *ঙ্গাজল ঘরের কোনে থাকে ঝিরঝির বৃষ্টির মত ঁুড়িঁুড়ি কাঁদে। পুকুরের জলে নিজের প্রতিমা-সদৃশ দেহখানি ভাসিয়ে রেখে ধীরে ধীরে বলে, 'সেই, ঘরে মা ছিল না, কে তুকমন্ত্র করায়, তাই স্বামী আমার অ-বশ হল।"*[৩৩]

মহাশ্বেতা দেবী রাধার এই বিপন্ন অবস্থার পরিচয়ের মধ্য দিয়ে তখ্মকালীন সময়ে এই বিপন্নতার সাবিষ্টক চিত্রটিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কারন মধ্যযুশ্ীয়

সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর প্রতি এই নিমমষ্টঅত্যাচার-শোষণ-পীড়ন চলত সমাজকে কেন্দ্র করেই, ফলে নারীর অবস্থা ছিল সবদিক থেকেই প্রান্তিকায়িত। রাধীর বাচনে নারীর বিপন্ন অবস্থার কথাই ব্যক্ত হয়ে ত্তঠে— *"পুরুষের যৌবন আষাঢ়ের বেলা, ডুবতে ম্ফিয়েত্ত ডোবে না, মেঞার যৌবন চক্ষের পাতা না ফেলতে অদেখা হয়।"*[৩৪]

আর তধ্মকালীন সময়ে পুরুষ বা স্বামীদেরত্ত যে স্ত্রীর বশীভূত করে রাখার জন্য তুকতাক- এরত্ত সাহায্য নিত তারত্ত পরিয়ে পাত্তয়া আলোচ্য উপন্যাসে। ট্মপন্যাসিক নারীর অন্ধসংস্কারের মধ্যেত্ত যে সামাজিক ত্ত মনস্তাত্ত্বিক কারন নিহিত তা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন উপন্যাসের মধ্যে।

মধ্যযু*ীয় সমাজে নারীর পুথি পড়া নিষিদ্ধ ছিল। শুধুমাত্র বিদ্যাজষ্টন বা জ্ঞানাজষ্টন পুরুষকেন্দ্রিক ছিল। নারীর জ*ধ্ম ছিল সেসময়ে ঘরের চার দেত্তয়ালের মধ্যে আবদ্ধ। এই চার দেত্তয়ালের বাইরে তাদের কোনো আলাদা জ*ধ্ম ছিল না। আলোচ্য উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী এই দিকটিকে ফুল্লরার মধ্যদিয়ে তুলে ধরেছেন। ফুল্লরার বাচনে স্পষ্ট হয়ে ত্তঠে নারীর পুথি পড়ার দিকটি—

"...পুঁথি পড়লে মেয়ে-ছেলেন কপাল পোড়ে তা জান না? আমার বেনে পাড়ার সই যতদিন পঢ়তে শেখেনি ততদিন বরটি বেঁচে ছিল। বেঁচে ছিল, বছরে একবার ঘরে আসত, কিন্তু সেবার কোথায় কাঞ্চীদেশে দেখে এল কা, মেয়েছেলে পুঁথি পড়ে! ... সেই বারই আশ্বিনের ঝড়ে ত্তর বরটি নৌকো ডুবি হয়ে মরল।"*[৩৫]

অথষ্টধ্ম মহাশ্বেতা দেবী ফুল্লরার এই উক্তিটির মধ্যদিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে, নারীরা শুধু পিতৃতন্ত্রের আধিপত্যে প্রান্তিকায়িত নয়, তারা যে অনেক অন্ধ কুসংস্কারের বশে বশীভূত এবং নারীর বিপন্নতার এক অন্যতম কারন এ কথাত্ত বলেছেন তিনি। তাই উপন্যাসে লক্ষনীয় যে চৈতন্যের আবিভ্ষ্টাবে বৈষ্ণব ধমষ্টাবলম্বী নারীরাত্ত বিদ্যাজষ্টনে সুযো* পেয়েছিলেন। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীরা বিদ্যাজষ্টনে কোনো সুযো* পায় নি। ফুল্লরার বাচনেত্ত উঠে আসে নারীর অবস্থানের তধ্মকালীন সময়ের নারী-বিভেদের স্বরূপটি—

"... ত্বঁরা তো বৈষ্ণব শ্! চৈতন্যচরিতামৃত বইখানি ত্বঁরা পূজো করেন। সেইজন্যে পড়া ত্বঁদের জানতে হয়।"*[৩৬]

ফুল্লরার এই উক্তির মধ্য দিয়ে তত্মকালীন সময়ে পুঁথি পড়াকে কেন্দ্র করে সমাজের বিভাজন যেমন দাঁড়িয়েছিল, তেমনি নারীর উপর সমাজের কতৃক্টত্বত্ত বিশেষ ভাবে স্পষ্ট হয়ে ত্বঠে ফুল্লরার বাচনে —

" যে মেয়ে পুঁথি পঢ়ে, বেটাছেলেরা তাদের দেখতে পারে না, বউ বলেছে!"[৩৭]

অথক্টত্ম ফুল্লরার এই বাচনই নারীর অবস্থানের স্বরূপটিকে তুলে ধরে। কারন তত্মকালীন সময়ে যে নারীর পুথি পড়া সমাজে স্বীকৃত ছিল না। আর সমাজে যে নিম্নবর্*ক্টর অন্ত*ক্টত নারীর পরিসর রয়েছে তাত্ত উচ্চবর্*ক্টর ক্ষমতার দাপটে নিষ্পেষিত। গুণা আয়ীর উক্তির মধ্যদিয়ে এই দিক্‌টি স্পষ্ট হয়ে ত্বঠে, গুণাআয়ী ফুল্লরাকে বলে—

"তোর বাপ্ মোকে লাথ মেরে চুল ছিঁড়ে দেয় না? পুরুষ ছেলা মেঞা ছেলাকে হাঁকে ডাকে রাখবে তভে না সে পুরুষ?"[৩৮]

অথক্টত্ম ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়েকে একজন চুয়াড় ছেলে কোনো প্রকারেই বিয়ে করতে পারে না, কিন্তু একজন ব্রাহ্মণ সহজেই চুয়াড় রমণীকে উপপত্মী হিসেবে ভো* করতে পারে, তাতে ব্রাহ্মণের কোনো দোষ হয় না। অথক্টত্ম নারীর এই অসহায়তার কথা গুণা আয়ীর বাচনে উঠে আসে—

*"মাধাই ঠাকুর বাম্ভোন হয়্যে মোকে জলপাত্র ল্যিলে দোষ লাই,উ ছেনাটিকে ফুল্লরা লা*র ল্যিলে দোষ?"*[৩৯]

অথক্টত্ম গুণা আয়ীর এই বাচনের মধদিয়ে তত্মকালীন সমাজের বণক্টবৈষম্য, জাতপাতের ভেদাভেদ থাকলেত্ত উচ্চবর্*ক্টর পুরুষরা যখন নিম্নবর্*ক্টর অন্ত*ক্টত নারীকে রক্ষিতা বা রাখনি হিসেবে ব্যবহার করলেত্ত তাতে সমাজে কোনো দোষ থাকে না। কিন্তু উচ্চবর্*ক্টর অন্ত*ক্টত নারীর সঙ্গে নিম্নবর্*ক্টর মানুষের সম্পকক্ট

স্থাপন হলেই দোষ হয়। তাই উপন্যাসে দেখা যায় যে ফুল্লরার সঙ্গে চুয়াড় কবির সম্পর্ক ফুল্লরার অজানতে হলেও শেষ পর্যন্ত ফুল্লরাইকে দোষী হতে হয়।

আলোচ্য উপন্যাসে দেখা যায় যে, চুয়াড় হয়ে ব্রাহ্মণকে সাহায্য করার জন্য নিম্নবর্গের এক নারীর দণ্ড ভোগের একটি আখ্যান আছে, তা হল পালকাপ্য মুনির আখ্যান। পালকাপ্য মুনি একসময় নির্বাসনে ছিলেন, তিনি শোকে-দুঃখে শীর্ণ এবং তৃষ্ণার্ত। সেই সময় এক চুয়াড় রমনী জলের যোগান না পেয়ে ব্রাহ্মণের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য স্তন দুগ্ধ দিয়ে তার তৃষ্ণা মিটিয়েছিল। চুয়াড় হয়ে ব্রাহ্মণের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য সে মহাপাপের অধিকারী হয়। চুয়াড় মেয়ে হয়ে ব্রাহ্মণের মুখে নিজের দেহজ দুগ্ধ দেওয়ার জন্য সে মহাপাপী হয়েছিল। কারন সেটি সহজ ব্যাপার নয় তদ্বকালীন সময়ে। কিন্তু পালকাপ্য মুনি পরবর্তীতে মেয়েটির খোঁজ করেছিলেন এবং বলেছিলেন— *"যে আমার মায়ের কাজ করেছিল, সে মেয়েটি কোথায়?"*[৪০]

ব্রাহ্মণের এই প্রশ্নের উত্তর হিসেবে সে জানতে পেরেছিল যে, চুয়াড় রমণীটি তার পাপের শাস্তি হিসেবে আধিপত্যবাদী উচ্চবর্গীয় সমাজের মানুষেরা তাকে পাথর মেরে মেরে ফেলেছে।

মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারী জীবনের এ-এক বিচিত্র পর্যায়। কার আধিপত্যবাদী ক্ষমতার আস্ফালনে নারীর জীবন নানাদিক থেকেই প্রান্তিকায়িত।

'বিবেক বিদায় পালা' উপন্যাসে মধ্যযুগীয় সমাজ-সংস্কৃতির আদলে নারী সমাজের প্রান্তিকায়িত অবস্থানটি তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী। মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা যে নানাদিক থেকে অবহেলিত, পীড়িত, নির্যাতিত তারই চিত্র উপন্যাসের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। ঔপন্যাসিক পঞ্চদশ শতকের রাঢ় বাংলার সামাজিক ইতিহাস ভিত্তিক নারীর জীবনালেখ্য রচনা করেছেন। তাই উপন্যাসের মধ্যে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক সময়ের প্রেক্ষাপটে মধ্যযুগীয় বঙ্গদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের চিত্রটি ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের

মধ্যে যে নারী জ*তের পরিচয় পাওয়া তারা প্রায় প্রত্যেকেই বিপন্নতার অন্ধকারে নিমজ্জিত।

মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রথা স্বাভাবিক নিয়মে চলত। পুরুষেরা একাধিক বিয়ে করেও উপপত্নী রাখত এবং বৃদ্ধ বরের সঙ্গে মেয়েদের বিয়ে দেবার রীতিও তখন প্রচলিত ছিল। এইসব কারনেই তখনকালীন সময়ে নারীর অবস্থা অন্ধকারে আছন্ন হয়ে পড়েছিল। মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারীর এহেন অবস্থার চিত্র আলোচ্য উপন্যাসে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন।

"রাঙির বয়েস বারো, বেঙির নয়, চেঙের বুঝি তিন। তা, তিন বোনকে রাঙির বাপ একই বরে বিয়ে দিয়ে আইবড় নাম খণ্ডে রেখেছে।"[৪১]

অথর্থাৎ লেখিকা বোঝাতে চেয়েছেন যে শুধুমাত্র কন্যাদায়গ্রস্ত ভার থেকে নিজেকে বাঁচাতেই তাদের পিতা তারই এক সমবয়সী বৃদ্ধ বরের সঙ্গে নিজের কন্যাদের বিয়ে দিয়েছিল। কারন তখনকালীন সমাজে মেয়েদের 'আইবড়'[৪২] নামটাই খণ্ডানো ছিল সবচেয়ে বড় বিষয়। মেয়েদের আইবড় নাম খণ্ডাতে না পারলে সেই পরিবারকে সমাজে এক ঘরে করে রাখা হত। উপন্যাসে লক্ষ করা যায় যে, রাঙি ও বেঙির বিয়ের পর তাদের দু'জনকেই বৃদ্ধ বরের বাড়িতে পাঠানো হলে সেখানে সেই বৃদ্ধের এক উপপত্নী তাদের উপর অত্যাচার করে। পরিণামে রাঙিকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে ঐ উপপত্নীটি। উপপত্নীর সমস্যা যে তখনকালীন সময়ে ভয়ানক রূপ ধারণ করত তার পরিচয়টি আলোচ্য উপন্যাসে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে রাঙিকে বিষ খাইয়ে মারার মধ্য দিয়ে। কিন্তু বেঙিকে শেষ পর্যন্ত কোনোক্রমে সেই উপপত্নীর অত্যাচার থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। তবুও বেঙির জীবন বিপন্নতায় আছন্ন হয়ে যায় তাঁর বাপের বাড়িতে আসার পর। আসলে এই সব ঘটনা তখনকালীন সময়ে নারী জীবনের অন্ধকার দিকটিকেই সূচিত করে।

মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় নারীরা সর্বক্ষেত্রেই নিষ্পেষিত। সমাজ নারীকে তার যথাযথ মর্যাদায় আসীন হতে দেয় না। কারন যে পুরুষ নারীর সর্বনাশের

কারন হয়ে দাড়ায়, সেই পুরুষই আবার নারীকে বা চরিত্রকে অবিশ্বাস করে। তবুত্ত এই সমাজ নারীকে 'সতীদাহ'-এ নিয়ে যেতে অকুণ্ঠিত হয় না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার চাপে নারীরা নিপীড়িত, নিযষ্টতিত, শোষিত হলেত্ত সমাজ নারীকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে শাস্তি দেয়। ট্মপন্যাসিক বাচনে নারীর সামাজিক অবস্থানটি উদ্ভাসিত হয়ে ত্তঠে— *"বামনির মাথায় তেল, হাতে রাঙা কড় ত্ত পায়ে আলতা দেখলেই বামুন সন্দেহে *জষ্টন করে। বামুনের জীবনে এখন অবধি শুধু মেয়েদের সঙ্গেই পরিচয় হচ্ছে। অনেক মেয়ের সবষ্টনাশ বামুন হতে হয়েছে, তাই মেয়েদের সে বিশ্বাস পায় না।*

*ছেলেকে বলে 'য্যাতকাল পারবে পায়ের নীচে রাখবে, জানুঁ বাপ। তা কাছে হেঁসেলে ঢেঁকশেলে মেয়েছেলার ঠাঁই! আমার দেহ *ত হলে বেঁধেছেঁদে মা*কে সঙ্গে দেবে, জানুঁ? ই কাজটি তুমার।'"*[৪৩]

এথেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তধ্মকালীন সময়ে নারীর অবস্থান সবদিক থেকেই সংকুচিত ত্ত নিষ্পেষিত। তাদের কোনো সামাজিক মযাষ্টদাটুকু ত্ত ছিল না। তাই উপন্যাসে লক্ষনীয় যে, দাস-দাসী কেনা-বেচার ক্ষেত্রে ছেলে এবং মেয়ে উভয়কেই যেমন ব্যবহার করা হত, তেমনি তান্ত্রিক অভিচারের উদ্দেশ্যে নারীরাই শেষ পযষ্টন্ত শিকার হত।

*"*ভীর রাতে দূরের পল্লি থেকে মেয়েদের অস্ফুট কান্না শুনে বোঝা যায় তান্ত্রিক অভিচারের উদ্দেশে কে-কার মেয়েকে ধরে নিয়ে *েল।'"*[৪৪]

শুধু এটি নয়, তধ্মকালীন সমাজব্যবস্থায় যে রক্ষকই ভক্ষক তার চিত্রত্ত আখ্যানে ফুটে উঠেছে। সুলতানি আমলে রাজ পুরুষদের ব্যবহার ভালো ছিল না নারীদের প্রতি। রাজপুরুষদের আচরণের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে উপন্যাসের মধ্যে—

*"ছা*ল যেমন বয়েসকালে যথা ইচ্ছা তথা যায়, এ মায়াপুরে রাজপুরুষেরত্ত ছা*ল ব্যবহার।'"*[৪৫]

এই রাজপুরুষেরা মেয়েছেলে দেখলে তাদের পিছনে ছুটে যেত,-

"তারা মেয়েছেলে দেখলে সত্বর পাছু ধায় ত্ত 'তুম্ভি মোর বাপ' বললেত্ত রেয়াত করে না।"[৪৬]

তথ্মকালীন সময়ে নারীদের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। তাদের শুধুমাত্র পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যে জীবন অতিবাহিত করতে হত। তাদের নিজস্ব কোনো চাত্তয়া-পাত্তয়া, আবে*-অনুভূতি ছিল না। তাই ট্মপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী এই সময়ের নারীদের অবস্থার কথা বলতে গি*য়ে বলেছেন—

"সবচেয়ে বিপন্ন বোধহয় মেয়েরা, তারা রামের হাতেত্ত মরে, রাবণের হাতেত্ত।"[৪৭] পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সমাজে শ্রেণি*ত ত্ত জাতি*ত মান্যতায় যারা উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিল তাদের পারিবারিক জীবনে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যে নারীর স্থান ছিল সংকুচিত। আলোচ্য আখ্যানে নারীর এই দিকটি বিশেষ ভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

আখ্যানে বটুর পরিবারের যে চিত্রটি ট্মপন্যাসিক তুলে ধরেছেন তাতে মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থার নারীর অসহায়তা ত্ত নিষ্পেষণের দিকটিই উঠে এসেছে। তথ্মকালীন সমাজ ব্যবস্থায় আধিপত্যবাদী পরিবারে পুত্রসন্তান ত্ত কন্যা সন্তানের মধ্যে বিস্তর পাথক্ক্য ছিল। এই সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ পরিবারে পুত্র সন্তানকে যে চোখে দেখা হত, নারী সন্তানকে সেই চোখে দেখা হত না। তারা নারী সন্তানকে অবহেলার নজরে দেখেন। এই নারীরা তথ্মকালীন সমাজে পণ্য হয়ে দাড়িয়ে ছিল। ট্মপন্যাসিক বয়ানে এই দিকটিই উন্মোচন করে—

"উঁচু জাতে মেয়েরা পণ্যবই আর কিছু নয়। স্বামী হোক, বাপ হোক, মেয়েদের যেমন-তেমন পায়ে ঠেলতে পারে।"[৪৮]

উচ্চব*ক্ষীয় সমাজে নারীরা এভাবে সমাজের হাতে নিপীড়িত, নিযক্ষতিত, শোষিত হয়। উচ্চব*ক্ষীয় সমাজে নারীরা এভাবে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের শিকার হতে হয়। কারন-

"বামুণের ঘরের মেয়েসন্তান দূর ছাই, পুত্রছেলের বুকে ঠাঁই।"[৪৯]

তাই উপন্যাসে লক্ষ করা যায় যে, বটুর পিতা তার তিন মেয়ের অথষ্টধ্ম রাঙি, বেঙি ত্ত চেঙির বিয়ের ব্যাপারে কোনো প্রকার চিন্তা না করে, তারই সমবয়সী এক বৃদ্ধ বরের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। অথষ্টধ্ম মহাশ্বেতা দেবী তধ্মকালীন সময়ে সমাজের বিপযষ্টস্ত অবস্থার পাশাপাশি পারিবারিক জ*তেত্ত যে নারীরা সুরক্ষিত নয় তা আলোচ্য আখ্যানে তুলে ধরেছেন। নারীর কোনো সামাজিক মূল্য না থাকায় তধ্মকালীন সময়ে নারীর অবস্থা বিপন্নতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তাদের পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদী রাজনীতির বলি হতে হত। এই নারীরাই ছিল মধ্যযু*ীয় সমাজব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি অসহায় ত্ত বিপন্ন। প্রহ্লাদের বয়ানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তধ্মকালীন সময়ে নারীর বিপন্নতার চিত্রটি—

*"ই ভোবনে কারো সুখ নাই, কিন্তুক মেঞাদের দুঃখ অপার! মেঞারা! *াইবাছুর হতেত্ত অবোলা।"*[৫০] প্রহ্লাদের এ কথাই তধ্মকালীন সময়ের নারীর সমগ্ধ্র বিপন্নতার দিকটিকেই নিদেষ্টশিত করে।

মধ্যযু*ীয় সমাজব্যবস্থায় কীভাবে উচ্চব*ষ্টত্ত নিম্নবক্ষ্টর ভেদাভেদ প্রহ্লাদ ত্ত বাতাসির ভালোবাসাকে সাথষ্টক হতে দেয়নি তারত্ত ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আখ্যানের মধ্যে। বাতাসি প্রহ্লাদের ভালোবাসা পেতে চেয়েছিল, কিন্তু শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ব্রাহ্মণ ত্ত কায়স্থের মধ্যে যে জল বিভাজন রেখা বিরাজিত ছিল, তা এড়িয়ে *িয়ে তাদের মিলন সম্ভব নয় বলেই প্রহ্লাদ বাতাসির ডাকে সারা দেয় নি। সমাজ স্বীকৃতি দেবে না বলেই, বাতাসি শেষ পযষ্টন্ত আত্মহত্যা করে। তধ্মকালীন সময়ের জাত-পাতের দ্বন্দ্বই যে বাতাসির আত্মহত্যার কারন সেকথা উপন্যাসের মধ্যে ধরা পড়েছে—

"কায়েতের মেয়ে কি বামুনকে দোষ দিতে পারে?... এই নবদ্বীপ মণ্ডলীতে কত বামুন আছে তারা অব্রাহ্মণের ছায়াটি মাড়ায় না। ছোটোজাত-ছোটোজাত বলে সবাইকে অপমান করে।

বাতাসি তো কয়েতের মেয়ে, সে কি প্রহ্লাদকে দোষ দিতে পারে?"[৫১]

এই জাতিভেদ প্রথাই বাতাসিকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছিল। সে জানত যে, এই সমাজ প্রহ্লাদ ত্ত তাকে এক হতে দেবে না। তাই তো সে ঠাকুরের কাছে বলত—

‘‘... তোমার দয়াতে কীটপতঙ বাঁচে, নদী উল্টামুখে ধায়। তুমি মোকে আর জন্মে বামুনের ঘরে জন্ম দিত্ত।’’[৫২]

বাতাসির এ বয়ানটিই তথ্মকালীন সময়ের সমাজের উচ্চব*ষ্টত্ত নিম্নব*ষ্টর বিভেদটিকে স্পষ্ট করে তোলে। আর বাতাসির আত্মহত্যা সেদিকটিই ইঙ্গিত করে।

‘‘ বাতাসি ডুব দিল। জলের নীচে কত শান্তি, কোনো *লমাল নেই। বাতাসির সব জ্বালা জুড়িয়ে *ল। জলের নীচে এত শান্তি আছে বাতাসি তা জনত না কেন?’’[৫৩]

বাতাসির আত্মহত্যাই মধ্যযু*ীয় সমাজ ব্যবস্থার প্রতি নীরব প্রতিবাদকেই দ্যোতিত করে। কারন জাত-পাতের দ্বন্দ্বে অকালে ঝড়ে *ল একটি প্রাণ। বাতাসি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে দিয়ে যায় যে, তার মত মেয়েদের শেষ পযষ্টন্ত এভাবেই আত্মতৃপ্তির পথ খুঁজে নিতে হয়। তার এই নীরব প্রতিবাদ মধ্যযু*ীয় সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়। এভাবেই অন্ধ সংস্কারাছন্ন ত্ত সামাজিক প্রথায় আবদ্ধ বাতাসির মতো এক নারীর বিপযষ্টয়ের কথাই আলোচ্য আখ্যানে ব্যক্ত হয়েছে।

উচ্চবণেষ্টর হিন্দু সমাজে নারী জীবনের ভয়াবহ বাস্তবতা দেখে বটু *হ ত্যা* করে এবং সমাজ ব্যবস্থার তা*দেই সে হয়ে ত্তঠে এক ভণ্ড সন্ন্যাসী। বহু মানুষের কাছে সে দেবতায় পরিণত হয়েছে। এই সমাজ ব্যবস্থায় নারীর জীবন যে কোনো ভাবেই সুরক্ষিত নয়, তা ঔপন্যাসিক আলোচ্য আখ্যানে তুলে ধরেছেন। ঔপন্যাসিক বটুর মধ্য দিয়ে তথ্মকালীন সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে তুলে ধরেছেন। কারন যে সমাজব্যবস্থায় নারীরা লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত, পীড়িত সেই সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটি গুলিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই বটু বলে—

"বামুনের বামনাই ঘুচাব।... মেয়ে বিচে, সন্তানের লোউ শুষে যি বামুন বামনাই কর‍্যে, তারে লীলা দেখাব।"[৫৪]

অথষ্টাধ্ম তধ্মকালীন সমাজব্যবস্থার নারী শোষনের বা নারী নিপীড়ণের কু-ব্যবস্থাকে সে নষ্ট করে দিতে চেয়েছে। তাই বলেছে—

"পৃথিবী কত বড়ো আমি দেখে নেব। অনেক পাপ, অনেক অনাচার, দেবতা হব না আমি। মানুষ হয়েই দেখে নেব।"[৫৫]

ট্মপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী বটুর জীবনের মধ্যদিয়ে তধ্মকালীন সময়ের-সামাজিক অবস্থার বিপযষ্টস্ত স্বরূপটিকে তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে তধ্মকালীন সময়ে নারীর সামাজিক অবস্থান ত্ত নিপীড়নের ছবিটিত্ত স্পষ্ট রূপে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। নারীর কোনো সামাজিক স্বীকৃতি পযষ্টন্তত্ত তধ্মকালীন সময়ে ছিল না। এমনকি নারীরা যে তার পিতৃ*হেত্ত সুরক্ষিত নয়, তার প্রমাণ হিসেবে ত্তঠে আসে আলোচ্য আখ্যানে। যেখানে বটুর বোন বেঙিকে তারই পিতা বেচে দিয়েছে কাপালিকের কাছে সামান্য কিছু টাকার লোভে। এছাড়াত্ত তধ্মকালীন সময়ে 'জালপাত্র' বা উপপত্নী সমস্যাত্ত যে নারীর জীবনে ভয়াবহ সবষ্টনাশ ডেকে আনত তারত্ত স্বরূপ ফুটে উঠেছে রাঙির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। অথষ্টাধ্ম তধ্মকালীন সমাজব্যবস্থার পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতায়ণে নারীর জীবন বিপন্নতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। মহাশ্বেতা দেবী এই উপন্যাসে মধ্যযু*ীয় সমাজ ব্যবস্থার নানা বিপযষ্টস্ত ঘটনার পাশাপাশি নারী জীবনের বঞ্চিত, লাঞ্ছনার- নিপীড়নের স্বরূপটিকে তুলে ধরেছেন।

'বেনেবউ' উপন্যাসে ট্মপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী ষোড়শ শতকের রাঢ় বাংলার চিত্র তুলে ধরেছেন। এরই পাশাপাশি আখ্যানে উঠে এসেছে একাদশ বঙ্গাব্দের দামিন্যার সময় ত্ত পরিসরে বাংলার বেনে সমাজের অন্তেবাসী নারীর অবমূল্যায়ণ। মধ্যযু*ীয় প্রেক্ষাপটে আধুনিক যু*ের সময় ত্ত পরিসরকে তুলে ধরতে চেয়েছেন ট্মপন্যাসিক। উপন্যাসের ভূমিকা অংশে ট্মপন্যাসিক জানিয়েছেন-

"বেনেবউ এর কাহিনী সম্ভবত আজন্ত প্রাসঙ্গিক। আইন উপেক্ষা করে এখনো বহু বিবাহ চলছে। স্ত্রী ত্যা আখছার ঘটে, তবে এ ঘটনার পর নিচের তলার সমাজে মেয়েরা খাটতে বেরিয়ে পড়ে। ন্তপরতলার সমাজে এসব ঘটনার পরিণাম অন্যরকম হয়। আর 'ছেলের মা' না হতে পারলে তো আজন্ত বিবাহিতা মেয়েরা অপরাধী ভাবে নিজেকে। কন্যাভ্রূণবিনাশ নিচের তলার সমাজে বিরল। অথচ্ঞধ্ম এখনো আমরা একই সঙ্গে বিংশ শতকে ন্ত অন্যান্য শতকে বাস করি।"*[৫৬]

মধ্যযু*ীয় সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতায়নের শৃঙ্খলে আবদ্ধ নারী জীবনের স্বরূপটি ব্যক্ত করতে *িয়ে স্বাভাবিক ভাবেই আখ্যানে উঠে এসেছে সতীন সমস্যা, বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ, তন্ত্র-মন্ত্র, অন্ধ সংস্কার প্রভৃতির প্রসঙ্গ। আখ্যানের কাহিনি চণ্ডীমঙ্গল এর মুকুন্দরামের ছায়া অবলম্বনের রচিত হলেন্ত মহাশ্বেতা দেবী নিজস্ব হৃদয় রসে জারিত করে সেকালের সময়ের মধ্য দিয়ে বতন্টমানের সময়ের মধ্যে সেতু বন্ধন করতে চেয়েছেন। তধ্মকালীন সময়ের সমাজব্যবস্থার নারী জীবনের লাঞ্ছনার, শোষনের, নিপীড়নের ইতিহাস আলোচ্য আখ্যানে প্রয়োজনানুসারে জায়*া করে নিয়েছে। বেনে সমাজের বণিক *ণপতির স্ত্রী কনকার কোনো সন্তান না হন্তয়ার জন্য সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে অহনাকে। ফলে কনকার নারীত্ব লাঞ্ছিত হয়েছে। দিনের পর দিন অহনার উপর কনকার উধ্মপীড়ন-লাঞ্ছনা বেড়েই চলে। অহনার উপর কনকার এই অত্যাচার মধ্যযু*ের পারিবারিক ক্ষেত্রে সতীন সমস্যার জলন্ত স্বরূপটিকেই উপন্যাসে পরিস্ফুট করে। এছাড়ান্ত আখ্যানে লক্ষ করা যায় যে, পুকুর ঘাটে মেয়েদের কথাবাতন্টার উল্লেখের মধ্যে সতীনের সন্তানকে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলা, আতাপিসির আ*ের জীবন বণন্টনায় এক বৃদ্ধ বরের সঙ্গে তার বিয়ে ন্ত পরিণামে আতাপিসির বৈধব্য, এক অল্প বয়সের মেয়ের সঙ্গে সুধন্য আচায্যেন্টর বিয়ে এবং বিয়ের আ* অহনার কথাবাতন্টায় নানা ঘটনার উল্লেখের মধ্যদিয়ে তধ্মকালীন সময়ের নারীর সামাজিক অবস্থান ন্ত বিপন্নতার স্বরূপটি স্পষ্ট হয়ে ন্তঠে।

ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী উপন্যাসে অহনার জীবন কাহিনির মধ্যদিয়ে যেন একাদশ বঙ্গাব্দের সমাজের নারীর বিপন্নতার ছবিটিকে চিহ্নিত করে দেন। উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায় যে, মুকুন্দ তার স্ত্রীকে বলেছে— *"কত, কত রাত অবধি কান্না শুনি ত্তর, কত রাত অবধি। মা গো! মনে হয় বউ! দামিন্যা গ্রামের লক্ষী যেন কাঁদছেন। যেন বিচার চাইছেন। বিচার পান না, সেই দুঃখে কাঁদেন।"*[৫৭]

মহাশ্বেতা দেবী একাদশ বঙ্গাব্দের সমাজের আর্কেটাইপটি মুকুন্দকে দিয়ে দেখিয়েছেন—

*"দুধে সরে মানুষ করে অহনাদের বাবারা স্বচ্ছন্দে সতীন ঘরে বিয়ে দেয় ত্তদের।...বাঘিনীর হাতে ছা*ছানার ভার দিয়ে বিদেশে গেল বা কেন?"*[৫৮] মুকুন্দের এই ভাবনার মধ্যদিয়ে তথ্যকালীন সময়ের নারী জীবনের অন্ধকারের দিকটি ফুটে ত্তঠে। এছাড়াত্ত সতীন সমস্যা যে তথ্যকালীন সময়ে সমাজের নারী শোষণের নিপীড়নের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছিল আখ্যানে তা নানা ভাবে উঠে এসেছে। ফলে মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারী জীবন দুর্বিষহ-বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সতীন সমস্যার বিপর্যস্ত স্বরূপ দেখেই মুকুন্দর মনে ভেসে ত্তঠে সতীন সমস্যার বাস্তবিক রূপ ঙ্খ

"নিমতিতা নিসুন্দা তিতা, তিতা মাকাল ফল
সবার অধিক তিতা কন্যা, বোন সতীনের ঘর।"[৫৯]

অল্প বয়সেই অহনাদের মত মেয়েদের জীবন সতীনের ঘর-সংসার করে বন্দী হয়ে সতীনের লাঞ্ছনা, উগ্রপীড়ণ সহ্য করতে হত। ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবীর বয়ানে উঠে আসে মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থার এই বিপন্নতার ছবিটি— *"সতীনরা অহনাদের মারে ছেঁচে, কষ্ট দেয়। কখনো সতীন, কখনো শাশুড়ি, কখনো ননদ।"*[৬০]

ফলে মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থার এই সামাজিক অত্যাচার, উগ্রপীড়ণ, লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে অহনাদের মত এই সকল মেয়েরা জলে ঝাঁপ দেয়, *লায় দড়ি দেয়, বিষ খেয়ে আত্মহত্যার পথ বেঁছে নেয়। এছাড়াত্ত বাল্য বিধবা হত্তয়া,

বৃদ্ধ পাত্রের সঙ্গে মেয়েদের বিয়ে দেত্তয়া, চৌদ্দ বছর বয়সে সন্তানের মা হত্তয়া ইত্যাদি তথ্মকালীন সময়ের সমাজের নারী জীবনের বিপন্নতার দিকটিকেই সূচিত করে। ট্মপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী এই উপন্যাসের মধ্যে বত্তমান সময়ের মধ্যদিয়ে বি*ত সময়ের সমাজ ত্ত ইতিহাসের কথা তুলে ধরতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক পাথষ্প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-

"মহাশ্বেতা ঐ অতীত ইতিহাসের স্মৃতিতে দপষ্টণে যে তাঁর সময়কে, বত্তমানকে দেখে নেন, এটা পরবত্তী কালেত্ত থেকে যায়।... এ স্মৃতি আপাতভাবে ব্যক্তিক মনের হলেত্ত, আসলে এর তলায় থেকে যায় সামাজিক ইতিহাস।'[৬১]

তাই ট্মপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবীর রচনায় মধ্যযু*ীয় সময় ত্ত পরিসরের মধ্য দিয়ে বত্তমান সময়েরই কথা উঠে আসে। সেই সঙ্গে আলোচ্য আখ্যানে উঠে এসেছে অন্তেবাসী নারীর লাঞ্ছনার ইতিহাসত্ত । মধ্যযু*ীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারীর সন্তানহীনতার সমস্যাত্ত সতীন সমস্যা থেকে কোনো অংশে কম ছিল না। এর জন্য নারীকেই দোষারোপ করা হত। কনকা সন্তানহীনা ছিল বলেই সমাজ ত্ত পরিবারের নানা প্রকার যাতনা ত্ত *ঞ্জনা তারই উপর বষিষ্ত হত। স্বামী ত্ত শাশুড়ির কাছ থেকে তাকে শুধু যাতনাই সহ্য করতে হত-

*"শাশুড়ীর *াল, আর স্বামীর হাতে চড়-চাপড়, এ ছিল কনকার নিত্য পাত্তনা।'*[৬২]

কনকা বুঝতে পেরেছিল যে, বন্ধ্যা মেয়েছেলে তার স্বামীর দ্বিতীয়বার বিয়েতে সম্মতি না দিলে সমাজে সে কারোর কাছ থেকে কোনো সমথষ্ন পাবেনা। এছাড়াত্ত কনকার কোনো সন্তান না থাকায় ভিক্ষুক বা সন্ন্যাসী কেউই *ণপতির বাড়িতে ভিক্ষা নিতে ঢোকে না—

*"*ণপতি ভিখারী-বাউল-বোষ্টমকে প্রথম ভিক্ষা দিতে চায়। আটকুঁড়োর ঘর থেকে কোন ভিক্ষাথষ্ী দিনের প্রথম ভিক্ষা নেয় না। পাড়াপড়শী প্রাতঃ কৃত্যের জন্য মাঠে *েলে *ণপতির দিকে পিছন ফিরে হা*তে বসে।*

*এ দুঃসহ সামাজিক অশ্রদ্ধা থেকে *ণপতি বাঁচতে চায়।'*[৬৩]

এর জন্য নারীকেই সমাজে দোষারোপ করা হত। তাই *ণপতি সকল প্রকার সামাজিক অশ্রদ্ধা থেকে বাঁচার জন্য দ্বিতীয়বার বিয়ে করে অহনাকে। মুকুন্দর বউ এর কথাতেই *ণপতির বিয়ের কথা জানা যায়— *"শুনেছ?... *ণপতি বেনে নাকি কোন টুকটুকে সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করছে।"*[৬৪]

কিন্তু কনকার স্নেহমমতার বাতাবরণ একদিন ছিড়ে *েল। অহনাকে দাঁড় করিয়ে দিল জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে। স্বাভাবিক ভাবেই অহনার জীবনে নেমে, আসে অন্ধকার, সে সব হারিয়ে ভিখারিণী।

*"ছোট, এতটুকু একটা লাল কাপড়ের পুঁটলি। চারদিক সেলাই করা। কি আছে ভেতরে। কনকা দাঁতে সেলাই ছিঁড়ল কটু*ন্ধ ভষ্ম। কনকা কেঁপে উঠল।"*[৬৫]

এরপর থেকেই যেন কনকার অন্তরে প্রবল ঝড় বয়ে যায়। মধ্যযু*ীয় সমাজ ব্যবস্থায় যে সামাজিক অন্ধ-সংস্কার অথষ্টধ্ম তন্ত্র- মন্ত্র, তুক-তাক উপন্যাসের কাহিনি পটে পরিবতষ্টন এনে দেয়। কারন *ণপতির বালিশের ভেতরে একটি লাল রঙের কাপড়ের 'পুঁটলি'ই অহনার জীবনে ডেকে আনে সবষ্টনাশ। শুরু হয় অহনার উপর কনকার শারীরিক নিযষ্টতন, উধ্মপীড়ণ। তধ্মকালীন সময়ে তন্ত্র-মন্ত্র, তুক-তাক বশীকরণ ইত্যাদি সামাজিক অন্ধ সংস্কারগুলো যে সমাজের *ভীরে প্রবেশ করেছিল তারই স্বরূপ ফুটে উঠেছে আলোচ্য ঘটনায়। অহনা ত্ত কনকার এই দুই সতীনের সম্পকেষ্ট মধ্যে ফাটল ধরেছিল মধ্যযু*ীয় এই অন্ধ-সংস্কারের ফলেই। একাদশ বঙ্গাব্দের নারীর জীবনের এই লাঞ্ছনা ত্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সত্তা জা%্রত হয়নি। তাই আখ্যানে শোনা যায় এই বয়ান—

" কিন্তু একাদশ বঙ্গাব্দের ঠাকুর দেবতার কান নেই, হৃদয় নেই, ক্ষমতা নেই।"[৬৬]

অহনার উপর সতীন সমস্যার যে অত্যাচার উধ্মপীড়ন-নিপীড়নের চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে, তা মধ্যযু*ীয় সমাজ ব্যবস্থার নারী জীবনের বিপন্নতার দিকটিকেই ইঙ্গিত করে।

"এখন দামিন্যার রাতের আবহসংগীত এক অসহায়া নির্যাতিতা বালিকার করুণ কান্না। এ কান্না পাড়ায় পাড়ায় ঘুম কেড়ে নেয়।"[৬৭]

মধ্যযুগীয় সময় পরিসরে নারীর উপর অকথ্য অত্যাচার এবং তার প্রতিকার না করা যে সামাজিক অভিশাপ রূপে সমাজে বর্ষিত হত, তা বসুভূতি দত্তের বয়ানেই ব্যক্ত হয়েছে—

"রমণী যখন নিগৃহীতা, তার কান্নার যখন প্রতিকার হয় না, তখন দেশের দুর্দিন আসন্ন।"[৬৮] কনকার অত্যাচারে অহনার গায়ে কালসিটে, চামড়া ফাটা ফাটা। পিঁঠে মারের দাগ বড় বেশি, কেননা অহনা তাঁর পেট বাঁচাতে চেয়েছে। কিন্তু অহনা জানে যে, তার সন্তান জন্ম অবধি সে বাঁচবে না। সে এও জানে—

"গণপতি সংবাদ পেলে পাখি হয়ে উড়ে এসে তাকে বুকে আগলে নিয়ে যেত নিরাপদ আশ্রয়ে, কিন্তু গণপতির সঙ্গে তার দেখা হবে না।"[৬৯]

তলপেটে যেন লোহার শেল বেধে অহনা বসে পড়ে, রক্তধারা বয়ে যায়। সন্তানের মা হওয়ার জন্য গণপতি তাকে এনেছিল। সে নানা নির্যাতন সহ্য করেও মা হবার সাধে পেটটি বাঁচাত সতীনের হাত থেকে। কিন্তু মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় একজন স্ত্রী নানা নির্যাতন সহ্য করেও তার স্বামী ও সন্তানের মুখ চেয়ে বেঁচে থাকতে চায়। অহনার মনের মধ্যে ভেসে ওঠা এই বয়ানের মধ্য দিয়েই তথ্যকালীন নারী জীবনের বিপন্নতার দিককেই স্পষ্ট করে তুলেছে—

"যাবি তো আমারে নিয়ে যা বাছা। ঘরে স্বামী নাই, গর্ভে তুই নাই, অহনা কারে নিয়ে জীয়ে থাকবে?"[৭০]

সকালে আতাপিসি অহনাকে সবার আগে দেখেছিল। গণপতি ত্রিণয়নীতে ঢুকেই জানল যে আজ আড়াই মাস অহনা নেই, আতঙ্ক চিৎকারে গণপতি বলে উঠেছিল— *"দামিন্যায় মানুষ নাই রে! অহনারে কেউ বাঁচাল না রে! ঠাকুর নাই, দেবতা নাই, মানুষ নাই!"*[৭১]

গণপতির এই উক্তিই তথ্যকালীন সমাজে নারীর অসহায়ত্ব ও বিপন্নতার

দিকটিকেই সূচিত করে। মহাশ্বেতা দেবী মুকুন্দের চণ্ডীপূজার মাঙ্গলিক প্রসঙ্গকে গুরুত্ব না দিয়ে তার ভেতর থেকে যেমন বের করে এনেছেন দীর্ঘকালের জমে থাকা মধ্যযুগীয় সমাজের সামাজিক ইতিহাসকে, তেমনি সেই সঙ্গে উপন্যাসে উঠে এসেছে মধ্যযুগীয় সমাজের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারী জীবনের বিপন্নতার স্বরূপ। অহনার জীবনের সমস্যা, তার অসহায়ত্ব মুকুন্দকে *ভীরভাবে নাড়া দিলত্ত সে ছিল অসহায়। সে নিজেই বলেছে— ''সত্যিই দামিন্যায় আমরা অমানুষ বটি।''[৭২]

অহনার দুঃখে সেত্ত দুঃখিত। তাই মুকুন্দ তাঁর কল্পনার কাহিনিতে দৈবী মহিমার অলৌকিকত্ব নিমর্ষ্ণণ করতে চেয়েছেন।

ত্মপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী উপন্যাসে অহনার মধ্য দিয়ে তধ্মকালীন সময়ের নারীর অবস্থানের স্বরূপটি তুলে ধরেছেন। মধ্যযুগীয় সমাজ বিভিন্ন অলৌকিকত্বের বিশ্বাসের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকায় এর নেতিবাচক প্রভাব নারীর উপরই বর্ষিত হত। তধ্মকালীন সমাজ যে নারী সত্তাকে শৈণ করে দেখত তা অহনার মধ্য দিয়ে আলোচ্য আখ্যানে উঠে এসেছে। মহাশ্বেতা দেবীর প্রিয় বিষয় ইতিহাস-ইতিহাসচর্চ্চা। *ণ ত্ত সমাজ জীবন আশ্রিত ইতিহাস চর্চ্চার মধ্যেই তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছেন। তাই তিনি বিশ্বাস করেন সাহিত্য স্রষ্টার কাছে এই ইতিহাস চর্চ্চাটি একান্তই আবশ্যিক। এই ইতিহাস অনুসন্ধানের তাগিদেই একজন লেখকের কাছে উন্মুক্ত হয় এক একটি যুগের ধারা বা বৈশিষ্ট্য। মহাশ্বেতা দেবী এভাবেই একটি যু* থেকে অন্য একটি যুগে পৌঁছে যাত্তয়ার চেষ্টা করেন এবং সময়কে বিচার, বিশ্লেষন ত্ত দলিলীকরণ করেন। তাই তাঁর বেনেবউ উপন্যাসে মধ্যযুগীয় সমাজ ত্ত সাংস্কৃতিক পরিসরে নারী জীবনের বিপন্নতার কথাই দ্যোতিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১) ভট্টাচাযষ্ট, তপোধীর, 'বাখতিন ঞ্ল তত্ত্ব ত্ত প্রয়ো*', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রকাশকাল-২০১০, পৃষ্ঠা-৫১

২) ভট্টাচাযষ্ট, সুতপা, 'বিশ শতকের কথা সাহিত্যঃ অপণ্ডিতের পাঠ', প্রকাশক-সুমন চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-২০০৯, পৃষ্ঠা-১০১

৩) সামন্ত, সুবল, (সম্পাদনা), 'বাংলা উপন্যাসঃ বীক্ষাত্ত অন্বীক্ষা', 'দেবেশ রায় ঞ্ল উপন্যাস ভাবনা', প্রকাশক-সুবল সামন্ত, এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৯০, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২৫

৪) ভট্টাচাযষ্ট, তপোধীর, 'নারীচেতনাঃ মননে ত্ত সাহিত্যে', প্রকাশক-অনুপকুমার মাহিন্দার, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-২০০৭, পৃষ্ঠা-৯৩

৫) দেবী, মহাশ্বেতা, 'আঁধারমানিক', প্রকাশক-শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম করুণা সংস্করণ-১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৩৫০

৬) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯

৭) তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৫

৮) তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৬

৯) তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৯

১০) তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৩

১১) তদেব, পৃষ্ঠা- ২৭৩

১২) তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫৭

১৩) তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫৭

১৪) তদেব, পৃষ্ঠা- ২৭২

১৫) তদেব, পৃষ্ঠা- ২৮৩

১৬) তদেব, পৃষ্ঠা- ২৮৩

১৭) তদেব, পৃষ্ঠা- ২৮৫

১৮) তদেব, পৃষ্ঠা- ২৮৬

১৯) তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৫০

২০) তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৫০

২১) পূবেক্তক্ত, 'বিশ শতকের কথা সাহিত্যঃ অপণ্ডিতের পাঠ', পৃষ্ঠা-১০২

২২) পূবেক্তক্ত, 'আঁধারমানিক', পৃষ্ঠা-৩৫০

২৩) তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৫০

২৪) তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৫০

২৫) তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৩৫

২৬) পূবেক্তক্ত, 'বিশ শতকের কথা সাহিত্যঞ্জ অপণ্ডিতের পাঠ, পৃষ্ঠা-১০২-১০৩

২৭) ঘোষ, নিমক্তল, 'মহাশ্বেতা দেবীঃ অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ', প্রকাশক-শ্রী বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৭১

২৮) পূবোক্তক্ত, সামন্ত, সুবল, (সম্পাদনা), 'বাংলা উপন্যাসঃ বীক্ষা ত্ত অন্বীক্ষা, 'মহাশ্বেতা দেবীঃ উপন্যাস ভাবনা', পৃষ্ঠা-১৮

২৯) ভট্টাচাযক্ত, তপোধীর, 'উপন্যাসের ভিন্নপাঠ', প্রকাশক—দেবাশিষ ভট্টাচাযক্ত, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯ প্রথম প্রকাশ-১৪১২, পৃষ্ঠা-৮৯

৩০) দেবী, মহাশ্বেতা, 'কবি বন্দ্যঘটী *ঞ্চির জীবন ত্ত মৃত্যু', প্রকাশক-বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ-১৪১০, পৃষ্ঠা-৫৪

৩১) তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৭

৩২) তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৮

৩৩) তদেব, পৃষ্ঠা- ৬০

৩৪) তদেব, পৃষ্ঠা- ৬০

৩৫) তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৯

৩৬) তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৯

৩৭) তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৯

৩৮) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪২

৩৯) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪০

৪০) তদেব, পৃষ্ঠা- ৯৫-৯৬

৪১) দেবী, মহাশ্বেতা,'বিবেক বিদায় পালা', দ্রঃ মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র', গুপ্ত, অজয় (সম্পাদনা), প্রকাশক-সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ-২০১৪, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৭।

৪২) মহাশ্বেতা দেবীর রচনাসমগ্রের-১২ খণ্ডে 'আইবড়' শব্দটিকেই আমরা আলোচনায় তুলে ধরেছি। এই শব্দটি মহাশ্বেতা দেবীর 'বিবেক বিদায় পালা' উপন্যাসে রয়েছে।

৪৩) তদেব, পৃষ্ঠা- ২৩

৪৪) তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৮

৪৫) তদেব, পৃষ্ঠা-২৯

৪৬) তদেব, পৃষ্ঠা-৩০

৪৭) তদেব, পৃষ্ঠা-২৩

৪৮) তদেব, পৃষ্ঠা-৮৫

৪৯) তদেব, পৃষ্ঠা-৪১

৫০) তদেব, পৃষ্ঠা-৬৭

৫১) তদেব, পৃষ্ঠা-৫৬

৫২) তদেব, পৃষ্ঠা-৫১

৫৩) তদেব, পৃষ্ঠা-৫৫

৫৪) তদেব, পৃষ্ঠা-৯৯-১০০

৫৫) তদেব, পৃষ্ঠা-১০১

৫৬) দেবী, মহাশ্বেতা, 'বেনে বউ', প্রকাশক-বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ-২০১০, পৃষ্ঠা-'ভূমিকা অংশ'

৫৭) তদেব, পৃষ্ঠা-২-৩

৫৮) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪-১৫

৫৯) তদেব, পৃষ্ঠা-১৫

৬০) তদেব, পৃষ্ঠা-১৪

৬১) পূবোক্তক্ত, সামন্ত, সুবল, (সম্পাদনা), 'বাংলা উপন্যাস ঙ্ম বীক্ষা ত্ত অন্বীক্ষা', বন্দ্যোপাধ্যায়, পাথক্তপ্রতিম, 'মহেশ্বতা দেবীঃ ব্যক্তি ত্ত ইতিহাসের মেল বন্ধন', পৃষ্ঠা-৪২

৬২) পূবেক্তক্ত, 'বেনেবউ', পৃষ্ঠা-১৯

৬৩) তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৬

৬৪) তদেব, পৃষ্ঠা- ৬০

৬৫) তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৮

৬৬) তদেব, পৃষ্ঠা-১২৫

৬৭) তদেব, পৃষ্ঠা- ১২৬

৬৮) তদেব, পৃষ্ঠা- ১২৬

৬৯) তদেব, পৃষ্ঠা- ১২৭

৭০) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩৪

৭১) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩৫

৭২) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩৫